লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৫ মহররম, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯৮ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঈসাব্দ

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

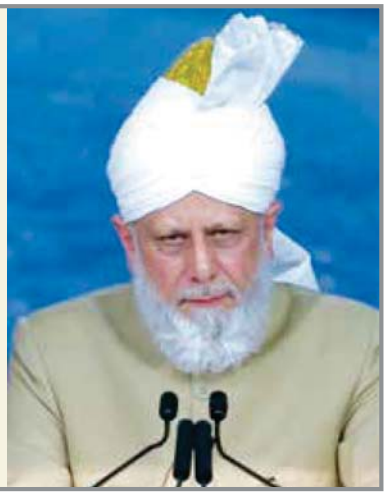

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ
اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ
الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمْ یَلِدْ ۙ
وَ لَمْ یُوْلَدْ ﴿۴﴾ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾
وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ
النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ﴿۵﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۳﴾
اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿۵﴾
الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿۶﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসার উদ্দেশ্য ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন আর তাকওয়ার মানে উন্নতি সাধন

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রতি বছরই সারা পৃথিবীর জামা'তসমূহ নিজ নিজ দেশে জলসার আয়োজন করে থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এই জলসার প্রবর্তন করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর প্রায় চার দশক পর্যন্ত কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর পাকিস্তানে খিলাফতের হিজরতের কারণে রাবওয়াতে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামা'তের বিস্তৃতি এবং প্রসার ঘটতে থাকে। যদিও কাদিয়ান থেকে হিজরতের পূর্বেই বহির্বিশ্বে জামা'তের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় আর পাকিস্তানের বাহিরের জামা'তগুলোও সমধিক দৃঢ়তা ও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। জামা'তের এই উন্নতি দেখে বিরোধিরা সরকারকে দিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্পেষণ মূলক আইন প্রণয়ন করায়, যার কারণে বাধ্য হয়ে যুগ খলীফাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হয় আর একই সাথে আহমদীদের একটি বড় সংখ্যাও সেখান থেকে হিজরত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর লন্ডনে হিজরতের পর লন্ডনের জলসাগুলো যেখানে নতুন মোড় নিয়েছে এবং ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জলসা এক নবরূপ ধারণ করেছে আর প্রতিদিনই এ ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্রই আজ জলসার এক নতুন চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

এভাবে বছরে তিন দিন সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও এর ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান বলতে কী বুঝায়? কোন বিষয় জানা এবং এর অন্তর্নিহিত গভীরতার ব্যুৎপত্তি লাভ করাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। শুধু বাহ্যিকভাবেই যেন এ কথার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে যে, আমরা মুসলমান বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার পাঠক, বরং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমরা যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করি। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমরা আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে মেনেছি, তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া মেনেছি, তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং এর উপর আমল করার উপায়ও অন্বেষণ করতে হবে। (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

সেই মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে এক মু'মিনকে সদা সাধনারত থাকা উচিত। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর একে আধ্যাত্মিকতা এবং আমলের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম বানাতে হবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যদি উন্নতি না হয়, তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন সাব্যস্ত হয়।

তাকওয়াও জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। যে কাজের জন্য আমাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল, তাকওয়ার ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে, তাকওয়া বা খোদাভীতি থাকা উচিত। তরবারি হাতে নিবে না, এটি নিষিদ্ধ। তাকওয়া অবলম্বন করলে সমগ্র পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। যাদের ধর্মীয় চিহ্নাবলীর বড় অংশই হল মদ, তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই হতে পারে না। নেকী বা পুণ্যের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের এ জামা'তকে এতটা সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করেন যে, তারা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে, তবে এটিই হল বড় সফলতা, এরচেয়ে অধিক কার্যকরী আর কিছুই হতে পারে না। এখন সারা পৃথিবীর ধর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে, সেগুলো হতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'তাকওয়া' লোপ পেয়েছে আর জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খোদা বানানো হয়েছে। প্রকৃত খোদা আত্মগোপন করেছেন আর সত্যিকার খোদার অসম্মান করা হচ্ছে। কিন্তু খোদা এখন চান, তাঁকে যেন মানা হয় এবং জগদ্বাসী যেন তাঁকে চেনে। যারা এই বস্তুজগতকেই খোদা মনে করে, তারা খোদার উপর পূর্ণরূপে ভরসা করতে পারে না। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। তিনি পবিত্র এবং নোংড়ার মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি তোমাদেরকে ফুরকান বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী দান করবেন। কেউ যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে বয়আত করে, কিন্তু কর্মদ্বারা একে সে সত্য প্রমাণ না করে এবং অঙ্গীকারের বিশ্বস্ততা প্রকাশ না করে, তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেন না। এভাবে যদি একজন নয়, বরং শতজনও যদি মারা যায়, তবে আমরা একথাই বলব, সে নিজের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে নি। আর সেই সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি, যা অন্ধকার দূর করে আর হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাস ও তৃপ্তি প্রদান করে, তা থেকে সে দূরে পড়ে আছে আর এ জন্যই সে ধ্বংস হয়েছে। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠার টীকা, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এটিই হল মূল কথা। তাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, তার উপর আমরা শুধু প্রতিষ্ঠিতই থাকব না বরং এ ক্ষেত্রে আমরা উন্নতিও করতে থাকব; ইনশাআল্লাহ্। সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ আগস্ট, ২০১৯ মোতাবেক ২৩যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.) গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ ৮

কবিতা– ১৭
পাঁচবেলার নামায
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

প্রেস বিজ্ঞপ্তি– ১৮
ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা সমাপ্ত করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

চলে গেলেন বাঙালি প্রেমিক এডভোকেট মুজিবুর রহমান ২২
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

কলমের জিহাদ ২৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

পিছন ফিরে দেখা- ২৯
ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন (অ-আহমদী বুযুর্গ ও পত্রিকার উদ্ধৃতিমূলে)
অধ্যাপক আলহাজ্জ ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম

এ আমার বিনীত অঙ্গীকার ৩২
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

বিবাহ সংবাদ ৩৪

দাম্পত্য জীবনের বিবাদ-কলহ নিরসনে হুযূর আকদাস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ৩৫

সংবাদ ৪১

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল কাহফ-১৮

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿۳۴﴾

৩৪। বাগান দু'টির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করতো এবং এতে (অর্থাৎ উৎপাদনে) কিছুই কম করতো না। আর এ দু'টির মাঝে আমরা একটি নদী[১৬৯০] প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۵﴾

৩৫। আর তার (বাগানে) অনেক ফল ধরতো। তাই আলোচনাকালে সে তার সঙ্গীকে (গর্ব করে) বললো, 'তোমার চেয়ে আমি ধনসম্পদে অনেক বেশি প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অনেক বেশি শক্তিশালী[১৬৯০-ক]।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ ﴿۳۶﴾

৩৬। আর সে নিজের প্রতি অন্যায়ে রত থাকা অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, 'এটি কখনো ধ্বংস হবে বলে আমি মনে করি না[১৬৯১]।

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۷﴾

৩৭। আর সেই প্রতিশ্রুত (ধ্বংসের) মুহূর্ত (কখনো) আসবে বলেও আমি মনে করি না। আর আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হলেও আমি নিশ্চয় (সেখানেও)-এর চেয়ে উত্তম আবাসস্থল পাবো।'

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿۳۸﴾

৩৮। সে তার সাথে যখন আলোচনা করছিল তার সঙ্গী তাকে বললো, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো ক.যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর বীর্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন) এবং এরপর তিনি তোমাকে মানুষ আকারে পূর্ণাঙ্গ করেছেন?'

১৬৯০। 'নদী' শব্দ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যামানাকে নির্দেশ করে, যাঁর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত শিক্ষার অংশসমূহ সংরক্ষিত হয়েছিল।

১৬৯০-ক। দরিদ্র এবং ক্ষমতাবিহীন মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্র্য ও পার্থিব উপায়-উপকরণের অভাবের জন্য ক্ষমতাশালী এবং উন্নত খ্রিষ্টান জাতিগুলো উপহাস করবে এবং ঘৃণা করবে।

১৬৯১। পার্থিব উন্নতির অহংকারমত্ত হয়ে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিগুলো অঢেল আরাম এবং বিলাসপূর্ণ জীবনে গা ভাসিয়ে দিবে এবং অতিশয় আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের এই ভুল ধারণা করবে যে তাদের ক্ষমতা, অগ্রগতি ও উন্নতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে এবং নিরাপত্তা ও আত্ম-প্রসাদের মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারে ডুবে যাবে।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকে দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর প্রতিফলক হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতিঃ হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতিঃ দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই অদ্বিতীয় বন্ধুর উপাসনা করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা নিজ মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমতঃ খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অতঃপর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের আবেগাকুল এক বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্তি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : ***ইয়া কানাবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন*** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই ***'বেলায়েত'*** (বন্ধুত্ব)।

এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করাও বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। ***কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।*** (হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩২তম কিস্তি)

দর্শকদের জানা আবশ্যক, মিঞা আব্দুল হক্ মুবাহালার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারি না, যে-সব মতবিরোধমূলক বিষয়ের দরুন কোনো পক্ষ 'কাফির' বা যালিম সাব্যস্ত হতে পারে না সে-রকম বিষয়ে মুবাহালা কিকরে জায়েয (বিধেয়) হবে? কুরআন করীম থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, উভয়পক্ষের এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাস থাকা আবশ্যকীয় যে তার বিরোধী পক্ষ মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বিরুদ্ধাচারী– লুক্কায়িত নয়। যাতে করে প্রত্যেক পক্ষই 'লা'নাতুল্লাহি আলাল্ কাযেবীন' বলতে (ও ঘোষণা করতে) পারে। এখন মিঞা আব্দুল হক্ যদি নিজের বুঝার দোষে আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, কিন্তু আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলি না বরং ভ্রান্তির শিকার বলে জানি আর ভুল-ভ্রান্তির শিকার কোন মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত করা জায়েয নয়। "লা'নাতুল্লাহি আলাল্ কাযেবীন"-এর পরিবর্তে 'লা'নাতুল্লাহি আলাল্-মুখ্‌তিয়ীন (ভুলের শিকার ব্যক্তিদের ওপর লা'নত) বলা কি জায়েয? কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমি যদি মুবাহিলার ক্ষেত্রে সত্যের বিরোধী বিপক্ষের প্রতি অভিসম্পাত করতে চাই তাহলে কীভাবে অভিসম্পাত করব? এমন ক্ষেত্রে আমি যদি "লা'নাতুল্লাহি আলাল্ কাযেবিন" বলি তবে তা সঠিক ও যথার্থ নয়। কেননা আমি আমার বিরুদ্ধাচারীদের মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না, বরং তা'ভীলকারী তথা জটিল ব্যাখ্যাশ্রয়ী ভ্রমগ্রস্ত বলে মনে করি। তারা (পবিত্র কুরআন ও হাদীসের) ভাষ্যসমূহকে সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ হতে ঘুরিয়ে কোন জোরালো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই অভ্যন্তর তথা রূপক অর্থের দিকে নিয়ে যায়। আর 'কিয্‌ব' বা মিথ্যা হল, কেউ যখন তার বিবৃতিতে নিজ অন্তরস্থ দৃঢ়বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি বলে, 'আজ আমি রোযায় আছি।' অথচ সে ভালোভাবে জানে এখনই সে খাবার খেয়ে এসেছে। অতএব এ ব্যক্তি 'কাযিব' বা মিথ্যাবাদী। মোটকথা, মিথ্যা এক জিনিস এবং ভ্রম বা ভুল ভিন্ন জিনিস। খোদা তা'লা বলেন, 'মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিসম্পাত কর।' এমনটি তো বলেন না যে, ভুলের শিকার লোকের প্রতি লা'নাত পাঠাও।

ভুল-ভ্রান্তির বশবর্তী লোকের সঙ্গে 'মুবাহালা বা মুলায়ানা' যদি বৈধ হত তবে পরস্পর মতভেদে জর্জরিত মুসলমানদের সকল ফির্কা পরস্পর মুবাহালায় অবতীর্ণ হলে নিঃসন্দেহে এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম চিহ্ন মুছে যেত। তদুপরি মুবাহালায় জামাত বা দলগত উপস্থিতিও আবশ্যিক। কুরআন করীমের ভাষ্যে মুবাহালায় জামাত বা দলের উপস্থিতি জরুরী বলে সাব্যস্ত। কিন্তু মিঞা আব্দুল হক্ অদ্যাবধি প্রকাশ করেন নি, প্রখ্যাত আলেম-উলামার মাঝে কতজন তাঁর সঙ্গে আছেন যারা তার সহযোগী হিসাবে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত? সেই সাথে 'নিসা ও আব্‌না (তথা তাদের স্ত্রী ও পুত্র সন্তানরাও) তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুবাহালার সব শর্ত যখন বস্তুতপক্ষে পুরো হয় না তখন আবার কিসে মুবাহালা হবে?! মুবাহালায় প্রথমে সন্দেহ নিরসনও জরুরী হয়ে থাকে। তবে তা কেবল তখনই আবশ্যক যখন মিথ্যাবাদী নির্ণয়ে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকে। কিন্তু মিঞা আব্দুল হক তো বাহাস-মুবাহাসার নামও উচ্চরণ করেন না। একটা পুরাতন ধারণা যা অন্তরে জমে বসে আছে অর্থাৎ মরিয়মপুত্র হযরত ঈসা মসীহ্ আকাশ হতে 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হবেন– এ ধারণাটিকে এমনভাবে বুঝে নেয়া হয়েছে, যেন সত্যিসত্যি আল্লাহ্‌র নবী হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম, যার ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল তিনিই কোন এক যুগে আকাশ থেকে নেমে আসবেন। অথচ এরকম ধারণা করাটা নি:সন্দেহে এক মস্তভুল। কেননা যে-ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যার মৃত্যু কুরআন করীমের ত্রিশ (৩০)টি আয়াত দ্বারা সপ্রমাণিত তিনি এখন কোথা থেকে ভু-পৃষ্ঠে চলে আসবেন? এমন কোন্ 'হাদীস' (কথা) আছে যা কুরআন করীমের সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত সমূহকে মনসুখ (রহিত) করে

দেয়?! "ফাবি আইয়ে হাদীসিন বা'দাল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ইউমিনুন।" [(আল-জাসিয়া : ৭) অর্থ: 'আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াত সমূহের পর তোমরা কোন্ কথার ওপর ঈমান আনবে?'– অনুবাদক]।

খোদা তা'লা মৃতকে জীবিত করার 'কুদরত' (ক্ষমতা) রাখেন– এটি সত্য বটে। কিন্তু উল্লেখিত এ কুদরত তাঁর প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। তিনিই পবিত্র কুরআনে বিশদভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যে-সব মানুষ মারা যায় তারা আর দুনিয়ায় ফিরে আসে না। যেমন, তিনি বলেন:

".....ফাইউম্‌সিকুল্-লাতি ক্বাযা আলাইহাল্-মওতু (সূরা আয্ যুমার : ৪৩) অর্থ: 'অত:পর যার জন্য 'মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাকে তিনি ধরে রাখেন...']। আর যেমন বলেন: "সুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতে তুব্ আসুন" (সূরা আল মুমিনুন : ১৭)। অর্থাৎ 'মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।" আর যেমন বলেন: 'হারামুন আলা ক্বারইয়াতিন আহ্‌লাক্‌নাহুম লা ইয়ারজিউন" (আল আম্বিয়া : ৯৬) অর্থ: 'যে জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি এর অধিবাসীরা আর কখনও ফিরে আসবে না।' আরও যেমন বলেন: 'ওয়া মাহুম মিন্‌হা বিমুখ্‌রাজীন' [আল-হিজর : ৪৯) অর্থ: ...এবং সেখান (তথা জান্নাত) থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে না] –অনুবাদক।

যদি বলেন যে, মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) স্বরূপ মৃত জীবিত হয়ে থাকে। তবে এর উত্তর হল, সেটি কখনও প্রকৃত মৃত্যু হবে না। সেটি মূর্ছা যাওয়া বা নিদ্রা ইত্যাদি ধরনের কিছু হবে। কেননা 'মা-তা' (মারা যাওয়া)-এর অর্থ অভিধানে 'না-মা' (নিদ্রা যাওয়া)-ও বটে। 'কামূস' (অভিধান গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য। ঐ সকল মৃত ব্যক্তি যারা এক মুহূর্তের জন্য জীবিত হয় তারা প্রকৃত মৃত্যুর আওতার বাইরে হয়ে থাকে। কেউ-ই একথার প্রমাণ পেশ করতে পারে না যে কখনও প্রকৃত ও সত্যিসত্যি কোনো মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছে এবং দুনিয়ায় ফিরে এসে সে তার উত্তরাধিকারের ন্যায্য ভাগ ফেরৎ নিয়েছে, তারপর দুনিয়ায় বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। বস্তুত: স্বয়ং 'মওত' (মৃত্যু) শব্দটি কুরআন করীমে বহুল অর্থ-বোধক। 'কাফির'কেও মৃত নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা ও যৌন বিলাসিতায় মরিয়া হওয়াও এক প্রকারের মৃত্যু। মৃত্যুর কাছাকাছি উপনীত ব্যক্তি 'মাইয়্যেত' (মৃত) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ব্যবহারিক জীবনেও এ তিন অবস্থাই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ মানবজীবনও উল্লিখিত তিন প্রকারেরই বটে। কিন্তু ফাইউম্‌সিকুল্ লাতি ক্বাযা আলাইহাল্ মওতু" (আয্ যুমার:৪৩) –এটি অতি স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ('মুহকাম') আয়াতসমূহের অন্যতম। এই একটিই নয় বরং কুরআন করীমে এই মর্মে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে, 'যে ব্যক্তি মারা যায় সে আর কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসবে না।' আর এটা তো সুপ্রকাশিত যে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যু ঘটেছে। তবু এত বিশদ ও অতি স্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও হাদীসাবলীতে ঈসা-ইবনে-মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ এসেছে দেখে এমনটি মনে করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা-ইবনে-মরিয়ম আকাশ হতে নেমে আসবেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারায় বলেন, 'হে বনি ইস্রাঈল! আমাদের সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমরা ফেরাউনের 'আল্' (তথা অনুগত দল) তোমাদের পুরুষ সন্তানদের মেরে ফেলতো এবং কন্যা সন্তানদের রেখে দিতো। আর সে-সময়ের কথা স্মরণ কর যখন নদী তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিল এবং ফেরাউন তার বাহিনীসহ নিমজ্জিত হয়েছিল। আর সে সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে যে, তোমরা খোদা তা'লাকে স্বচক্ষে না দেখে কখনও ঈমান আনবে না। আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন আমরা মেঘের ছায়ায় তোমাদের আচ্ছাদিত করেছিলাম এবং তোমাদের মান্‌না ও সালওয়া খেতে দিয়েছিলাম। আর স্মরণ কর যখন আমরা তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের পরিজনকে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করবে না। তোমরা এই অঙ্গীকারে কায়েম থাকার কথা দিয়েও তা রক্ষা কর নি। তোমরা তারপরও রক্তপাত এবং স্বজনদের তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার অব্যাহত রেখেছ। তোমরা সর্বদা এ রীতি এবং তোমাদের এ স্বভাবই বলবৎ রেখেছ যে, তোমাদের প্রতি যে নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন, তোমরা তাদের কতককে প্রত্যাখ্যান করেছ আর কতককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং কতককে হত্যাও করেছ।'

এখন বলুন, এ কথাগুলো যদি রূপক না হয়ে থাকে এবং এ আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে করা হয় তাহলে মানতে হবে, আয়াত সমূহে যে-লোকদের সম্বোধন করে কথাগুলো বলা হয়েছিল তারা সবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কাল যাবৎ জীবিত ছিল। আপনারা যখন মসজিদে বসে কুরআন করীমের তরজমা পড়ান তখন কি উল্লিখিত আয়াতগুলোর অর্থ এমনটি বুঝিয়ে থাকেন যে, এ আয়াতসমূহে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তারাই মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশা অবধি জীবিত ছিল? কিম্বা তারাই কবর থেকে জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল? তাই যদি হয়ে থাকে তবে আপনাদের উত্তর কি এটাই নয় যে, আরে ভাই ওরা তো সবাই মারা গেছে। এখন রূপকভাবে সম্বোধিত তাদের বংশধরই রয়েছে– যারা তাদের পূর্বপুরুষের কাজ-কর্মে রাজী (সন্তুষ্ট)। অন্য কথায়, এরা তাদেরই সত্তা (বা স্থলাভিষিক্ত)। অতএব এখন আপনারা বুঝে নিন, এ দৃষ্টান্তই (হাদীসে উল্লেখিত) ঈসা-ইবনে-মরিয়মের নযুল বা অবতরনের। (চলবে)

ভাষান্তর:

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩আগস্ট, ২০১৯ মোতাবেক ২৩যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.) গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

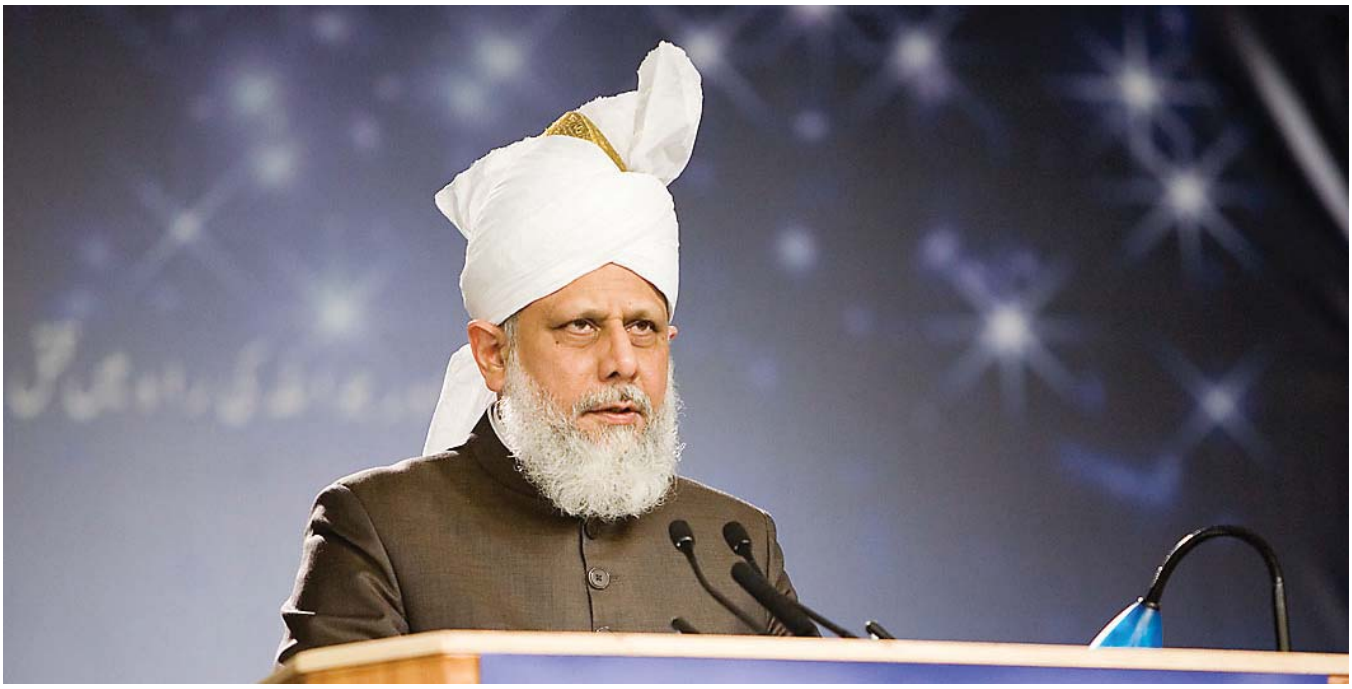

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আজ আমি যেসব সাহাবীর কথা বলব, তাদের মাঝে একজনের নাম হলো হযরত আসেম বিন আদী (রা.)। হযরত আসেম (রা.)-এর পিতার নাম ছিল আদী। তার সম্পর্ক ছিল বনু আজলান বিন হারেসা গোত্রের সাথে, যারা ছিল বনু যায়েদ বিন মালেক গোত্রের মিত্র। হযরত আসেম (রা.) ছিলেন বনু আজলান গোত্রের নেতা এবং হযরত মাআন বিন আদী (রা.)-এর ভাই।

বলা হয় যে, হযরত আসেম (রা.)-এর উপনাম ছিল আবু বকর। কিন্তু কারো কারো মতে তার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্, আবু উমর এবং আবু আমর বলেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আসেম (রা.) মাঝারি উচ্চতার মানুষ ছিলেন এবং চুলে মেহেদী লাগাতেন। হযরত আসেম (রা.)-এর পুত্রের নাম ছিল আবুল বারদা।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৪-৩৫৫, আসেম বিন আদী, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুলগাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১১, আসেম বিন আদী, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আসেম (রা.) এর কন্যার নাম ছিল সেহলা, যার বিয়ে হয়েছিল হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর সাথে আর এই বিয়ের মাধ্যমে তাদের তিন পুত্র ও এক কন্যা অর্থাৎ চার সন্তান জন্ম নেয়। যাদের নাম ছিল মাআন, উমর ও যায়েদ এবং আমাতুর রহমান সুগরা।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪, আব্দুর রহমান বিন অউফ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

বদর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে

কুবা এবং মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ 'আলিয়া'-র আমীর নিযুক্ত করেন। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, রওহা নামক স্থান থেকে মহানবী (সা.) হযরত আসেম (রা.)-কে মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ 'আলিয়া'-র আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেও তাকে (রা.) বদরের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার জন্য মালে গনিমতে (বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) অংশও নির্ধারণ করেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫, আসেম বিন আদী, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩, আসেম বিন আদী, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব কর্তৃক লিখিত 'সীরাতে খাতামান্নাবিঈন' পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: "মদিনা থেকে যাত্রার সময় তিনি (সা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনার আমীরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত রওহা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে তখন সম্ভবত এই ধারণায় যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ ব্যক্তি আর কুরাইশ বাহিনীর আগমনের সংবাদের দাবি হলো তাঁর (সা.) অনুপস্থিতিতে মদিনার প্রশাসন সুদৃঢ় থাকা উচিত, তাই তিনি (সা.) আবু লুবাবা বিন মুনযেরকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, তিনি শুধু নামাযের ইমাম হবেন কিন্তু প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবেন আবু লুবাবা। মদিনার উঁচু অংশের জনবসতি অর্থাৎ কুবার জন্য তিনি (সা.) আসেম বিন আদীকে পৃথক এক আমীর নিযুক্ত করেন।"

[সীরাত খাতামান্নাবেঈন (সা.), হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ, পৃ: ৩৫৪]

হযরত আসেম (রা.) উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে হযরত আসেম (রা.) ৪৫ হিজরী সনে মদিনায় মৃত্যু বরণ করেন আর তখন তার বয়স ছিল ১১৫ বছর। কারো কারো মতে তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত আসেম (রা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তার পরিবারের সদস্যরা ক্রন্দন আরম্ভ করলে তিনি বলেন, আমার জন্য ক্রন্দন কর না। কেননা আমি আমার জীবন পার করে এসেছি।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫, আসেম বিন আদী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৪, আসেম বিন আদী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) আর অনেক দীর্ঘ এক জীবন কাটিয়েছি।

মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দেন তখন তিনি (সা.) ধনীদেরকে খোদার পথে ধনসম্পদ এবং বাহন সরবরাহ করার আহ্বানও জানান। এতে বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে। এ সময়েই হযরত আবু বকর (রা.) নিজ ঘরের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে আসেন যা প্রায় চার হাজার দিরহাম ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি-না? তিনি উত্তরে বলেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) নিজ ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। এই প্রেক্ষিতে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) একশত আউকিয়া প্রদান করেন (এক আউকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে)। তিনি (সা.) বলেন, উসমান বিন আফফান (রা.) এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের মালিক, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে। এ উপলক্ষ্যে মহিলারাও নিজেদের অলঙ্কারাদি দান করে। এ উপলক্ষ্যেই হযরত আসেম বিন আদী (রা.), (যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে,) তিনি ৭০ ওয়াসাক খেজুর দান করেন। এক ওয়াসাক-এ ষাট সা' হয়ে থাকে আর এক সা' প্রায় আড়াই সের হয়ে থাকে বা আড়াই কিলো হয়ে থাকে। এদিক থেকে খেজুরের মোট ওজন হয় ২৬২ মণ।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪, গাজওয়া তাবুক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২, 'আউকিয়া' ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭, 'ওয়াসাক'-২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৮, 'সা', নাশার নুমানী কিতাবখানা লাহোর, ২০০৫)

পাকিস্তানে এক মণ-এ চল্লিশ সের হয় অথবা উনচল্লিশ বা আটত্রিশ কিলো হয়ে থাকে। যাহোক হযরত আসেম (রা.)ও এই উপলক্ষ্যে তার কাছে যে খেজুর ছিল তা দান করেন এবং বহুল পরিমাণে দান করেন। হযরত আসেম বিন আদী (রা.) সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) মসজিদে যিরার ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমর বিন অউফ মসজিদে কুবা নির্মাণ করে এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনি এখানে আসুন এবং নামায পড়ান। বনু গানাম বিন আওফ গোত্রের কিছু মানুষ যখন এই মসজিদটিকে দেখে তখন তারা বলে, চল বনু আমর যেভাবে মসজিদ নির্মাণ করেছে সেভাবে আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করি। তখন তাদেরকে ঘোর বিরোধী এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আবু আমের ফাসেক নামের এক ব্যক্তি তাদেরকে বলে, তোমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ কর আর যথাসম্ভব এতে

অস্ত্রশস্ত্রও জড়ো কর। তার উদ্দেশ্য ছিল, এটিকে নৈরাজ্যের আখড়া বানানো। সে বলে, আমি রোমান সম্রাট কায়সারের কাছে যাচ্ছি আর সেখান থেকে একটি রোমান সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো এবং এরপর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে এখান থেকে বের করে দিব।

মসজিদ নির্মাণের কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখন তারা অর্থাৎ তাদের লোকেরা মহানবী (সা.) সকাশে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে যে, রুগ্ন ও প্রতিবন্ধীদের সুবিধার জন্য আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি। কেননা নামায পড়ার জন্য তারা বেশি দূরে যেতে পারে না আর একইসাথে তাঁর (সা.) সমীপে তারা এ নিবেদনও করেন যে, এই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য আপনিও আসুন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন আমি সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, (কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন) ইনশাআল্লাহ্ যখন আমরা ফিরে আসবো, তখন আমি নামায পড়াব। এটি ছিল তবুকের যুদ্ধের সফর। তবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) মদীনার অদূরে অবস্থিত 'যী অওন' নামক জায়গায় অবস্থান করেন, মদীনা থেকে যার দূরত্ব এক ঘন্টার পথ। সেখানে অবস্থান করার সময় তাঁর (সা.) প্রতি মসজিদে যিরার সম্পর্কে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়; যা পবিত্র কুরআনে সূরা তওবায় উল্লেখ রয়েছে আর তা হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(সূরা আত্ তাওবা:১০৭)

অর্থাৎ, আর সেসব লোক যারা ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এমন ব্যক্তিকে ঘাঁটি সরবরাহের জন্য একটি মসজিদ বানিয়েছে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধে লিপ্ত, তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

মহানবী (সা.) এরপর মালেক বিন দুখশাম এবং মাআন বিন আদীকে ডাকেন আর তাদেরকে মসজিদে যিরার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আদী এবং আমর বিন সাকান আর ওয়াহ্শী {যে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল} এবং সুয়ায়েদ বিন আব্বাসকেও মহানবী (সা.) এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যুরকানীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে একথাও লেখা আছে যে, খুব সম্ভব মহানবী (সা.) প্রথমে দু'জনকে প্রেরণ করেছিলেন, পরে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আরো চার জনকে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে মসজিদে যিরার ভেঙে ফেলার ও আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তারা ক্ষিপ্রতার সাথে বনু সালেম গোত্রের কাছে পৌঁছেন, যা হযরত মালেক বিন দুখশাম এর গোত্র ছিল। হযরত মালেক বিন দুখশাম তখন হযরত মাআনকে বলেন, আমাকে কিছুটা সময় দাও যেন আমি ঘর থেকে আগুন নিয়ে আসতে পারি। অতএব তিনি ঘর থেকে খেজুরের শুকনো শাখায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে আসেন। এরপর তারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদে যিরারের কাছে পৌঁছেন এবং সেখানে গিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। এই ঘটনার কিয়দংশ ইতোপূর্বে হযরত মালেক বিন দুখশাম এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছিলাম। যাহোক, তখন এই মসজিদের নির্মাতারা সেখানে উপস্থিত ছিল কিন্তু আগুন লাগানোর পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন ঘর নির্মাণের জন্য তিনি (সা.) মসজিদের এই জায়গাটি আসেম বিন আদীকে প্রদান করতে চান (অর্থাৎ যে সাহাবীর এখন স্মৃতিচারণ হচ্ছে)। কিন্তু আসেম বিন আদী (রা.) বলেন, এই জায়গা আমি নিব না। এ অস্বীকৃতি তিনি এ জন্য জ্ঞাপন করেন যে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যা অবতীর্ণ করতে চেয়েছিলেন করেছেন। অর্থাৎ- এটি তো এমন স্থানে নির্মিত হয়েছে যেখানে এটি নির্মাণ করা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন নি, তাই আমি এই জায়গা নিতে চাই না। আসেম বিন আদী (রা.) বলেন, আমার ঘরও আছে আর আমি দ্বিধাদ্বন্দেও রয়েছি, তাই ক্ষমা চাচ্ছি আর এটি সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করা উত্তম হবে। কেননা তার ঘর নেই এবং তিনি এখানে নিজের ঘর বানাতে পারবেন। অতএব মসজিদে যিরারের যে জায়গা ছিল তা মহানবী (সা.) সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করেন।

ইবনে ইসহাকের মতে মসজিদে যিরারের নির্মাতা মুনাফিকদের নাম হলো, খিযাম বিন খালেদ, মুয়াত্তেব বিন কুশায়ের, আবু হাবীবা বিন আযআর, আব্বাদ বিন হুনায়েফ, জারিয়া বিন আমের এবং তার দুই পুত্র মুজাম্মে বিন জারিয়া এবং যায়েদ বিন জারিয়া, নুফায়েল বিন হারেস, ইয়াকযাল বিন উসমান এবং ওয়াদীআ। যাহোক, আবু আমের রাহেবের সাথে এরা জোটবদ্ধ ছিল, মহানবী (সা.) যার নাম ফাসেক রেখেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়া রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭০-৪৭২, গাজওয়া তাবুক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (শারাহ আযযুরকানী, আলাল মাওয়াহেবুল্লাদুনইয়া আলযুযয়ের রিবা, পৃ: ৯৭-৯৮, সুম্মা গাজওয়াতে তাবুক, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একবার দিল্লী সফরে যান, তখন দিল্লীর জামে মসজিদ দেখে তিনি (আ.) বলেন, "খুবই সুন্দর এক মসজিদ, তবে মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য অট্টালিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সেই নামাযীদের সাথে, যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "এসব মসজিদ বিরাণ বা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।" সে যুগেও বহু মসজিদ

পরিত্যক্ত বা বিরাণ ছিল। তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর মসজিদ খুবই ছোট ছিল, প্রথমদিকে খেজুরের শাখা দিয়ে তার ছাদ বানানো হয়েছিল আর বৃষ্টির সময় সেই ছাদ দিয়ে পানি পড়তো।" তিনি (আ.) বলেন, "মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের ওপর নির্ভর করে। মহানবী (সা.)-এর যুগে জগৎপূজারীরাও একটি মসজিদ বানিয়েছিল, তা খোদার নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয় আর সেটির নাম ছিল মসজিদে যিরার, অর্থাৎ কষ্টদায়ক মসজিদ। সেই মসজিদটি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়।" তিনি (আ.) বলেন, মসজিদ সম্পর্কে নির্দেশ হলো- "তা যেন তাকওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭০)

অতএব, এটি হলো মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বর্তমানে মুসলমানদের একটি শ্রেণির মাঝে মসজিদ আবাদ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আগ্রহ বা মনোযোগও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর সৃষ্টি হয়েছে। কোন সুযোগ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, উদ্দীপনা বা সাহস যদি সৃষ্টি হয়েও থাকে অথবা ইবাদতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েও থাকে কিংবা বাহ্যিক ইবাদতের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েও থাকে, তবে তা-ও তাঁর দাবির পরই হয়েছে। খুবই সুন্দর মসজিদ তারা নির্মাণ করে এবং গুরুত্বের সাথে মসজিদ বানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তান ও অন্যান্য কতিপয় দেশে কিছু সংখ্যক লোক এটিকে আবাদ করার প্রতিও দৃষ্টি দিচ্ছে। কিন্তু এসব মসজিদ তাকওয়া-শূন্য। আল্লাহ তা'লা মসজিদে যিরার ধ্বংস করে দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এর পরবর্তী আয়াতে এটিও খুবই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সেটিই প্রকৃত মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অ-আহমদী আলেমরা মনে করে যে, মসজিদে দাঁড়িয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা আর তাঁর সম্বন্ধে নোংরা ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা ও জামা'তকে গালি দেয়াই হলো তাকওয়া। আর শুধু তা-ই নয় বরং প্রতিনিয়তই এমনসব ঘটনা দেখা যায় যে, এসব মসজিদের ইমামত ও বিভিন্ন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণে তাদের নিজেদের মাঝেও গালিগালাজ ও বিবাদ চলতে থাকে। এখন তো অধিকাংশ ঘটনাই ভাইরাল হয়ে যায় অর্থাৎ দেখা যায়, মসজিদে দাঙ্গা-ফাসাদ হচ্ছে এবং একে অপরকে গালিগালাজ করছে। সুতরাং এসব বিষয়ের মাধ্যমে এটিই সুস্পষ্ট হয় যে, এদের মাঝে তাকওয়ার ঘাটতি রয়েছে এবং তাদের মসজিদগুলোতে মসজিদের প্রকৃত প্রাপ্য প্রদান করা হচ্ছে না। তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আহমদীদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের মসজিদগুলো তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখেই আমরা যেন এসব মসজিদ আবাদ করার জন্য আসি। অতএব, এটিই হলো প্রকৃত সত্য বিষয়, যদি এটি বজায় থাকে এবং যতদিন এটি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ততদিনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির ওয়ারিস হতে থাকবো।

لَمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "এতে আবু আমেরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে,যে খ্রিষ্টান ছিল। তার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাঝে একটি ষড়যন্ত্র ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি এই মসজিদে একবার নামায পড়েন তাহলে কিছু মুসলমান এদিকেও আসবে আর এভাবে মুসলমানদের জামাতকে আমি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলব। এই আবু আমের নিজের একটি রুইয়া বা স্বপ্নও প্রচার করে রেখেছিল যে, আমি দেখেছি, মহানবী (সা.) 'ওয়াহীদান ত্বারীদান শারীদান' অর্থাৎ বিতাড়িত অবস্থায় (নাঊযুবিল্লাহ্) নিঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তার এই কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, "স্বপ্নটি সত্য"। সে ঠিক বলেছে। আসল কথা হলো আর এ জন্য এটি সত্য যে, "সে এতে নিজের অবস্থাই দেখেছে, আর এমনই হয়েছে।" তিনি (সা.) কারো নাম উল্লেখ করেন নি- এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন- নাম উল্লেখ না করার পেছনে প্রজ্ঞা হলো, "ভবিষ্যতেও যদি কেউ এমনটি করে তাহলে তার পরিণতিও এমনই হবে।"

(হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০, তফসিরাধিন আয়াত ওয়াল্লাযিনাত্তাখাজু মাসজিদান যিরারান)

অতপর আমরা দেখি যে, আজও শত্রুদের পরিণতি ঠিক এমনই হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো- হযরত আমর বিন অউফ (রা.)। হযরত আমরের নাম উমায়েরও বর্ণিত হয়েছে। তার পিতার নাম ছিল অউফ। হযরত আমর (রা.)-এর ডাক নাম ছিল আবু আমর। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন আর ইবনে সা'দের মতে তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন।

(আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ইবনে হাযার আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫২-৫৫৩, আমর বিন অউফ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, আমর বিন অউফ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪, দারুল ফিকর, ২০১২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

অর্থাৎ ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তা, জীবনীকার এবং হাদীসবিশারদগণ এই সাহাবীর নাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন আর তার সম্বন্ধে অনেক বেশি বিতর্ক রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ এবং আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী প্রমুখ তার নাম 'আমর' বর্ণনা করেছেন। অথচ ইবনে হিশাম, মূসা বিন উকবা, আবু মা'শার, মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াক্দী প্রমুখ তার নাম উমায়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী উভয়ে সহীহ্ বুখারীর তফসিরকারক। তাদের মতে আমর বিন অওফ এবং উমায়ের বিন

অওফ– নাম দু'টি একই ব্যক্তির।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, উমায়ের বিন অউফ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসতিয়াবা ফি মা'রেফাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৪, আমর বিন অউফ আল আনসারী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উমদাতুল কারী, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ১২১, কিতাবুল যাজিয়া, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ইবনে হাযার আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫২-৫৫৩, আমর বিন অউফ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুলগাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৬, আমর বিন অউফ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৩, ওয়া মান বানী আমর, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

ইমাম বুখারী'র মতে হযরত আমর বিন অউফ আনসারী কুরাইশদের বনু আমের বিন লোই গোত্রের মিত্র ছিলেন, অন্যদিকে ইবনে হিশাম এবং ইবনে সা'দ তাকে কুরাইশদের বনু আমের বিন লোই' গোত্রের সদস্য আখ্যা দিয়েছেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এগুলোর সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আমর বিন অউফ আনসারদের অওস অথবা খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন আর তিনি মক্কায় গিয়ে অবস্থান করেছিলেন আর সেখানে কতক লোকের মিত্র হয়েছিলেন। আর এই দিক দিয়ে তিনি আনসারও আবার মুহাজেরও।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিযইয়া, বাবুল জিযইয়াতি ওয়ামুয়া দাআতে মাআ আহলিল হারবে, হাদীস নম্বর ৩১৫৮) (উমাদাতুল কারী, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ১২১, কিতাবুল জিযইয়া, ২০০৩ সে বৈরুতে মুদ্রিত) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৩, ওয়ামান বনী আমর, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০, আমর বিন অউফ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আমর বিন অউফ (রা.) প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪, আমর বিন অউফ, ২০১২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আমর বিন অউফ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় কুবা'য় হযরত কুলসুম বিন হিদাম (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আমর বিন অউফ (রা.) বদর, উহুদ ও পরিখার পাশাপাশি অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, উমায়ের বিন অউফ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬, সা'দ বিন খায়সামা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আমর বিন অউফ (রা.)-এর মৃত্যু হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হয় আর হযরত ওমর (রা.) তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন।

(আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ইবনে হাযার আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৫৩, আমর বিন অউফ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মাআন বিন আদী (রা.)। হযরত মাআন (রা.) আনসারদের বনু আমর বিন অউফ গোত্রের মিত্র ছিলেন।

(ইবনে হিশাম, পৃ: ২৯, ইসমায়ে মিন শাহাদুল আকাবা, ২০০৯ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মাআন (রা.) হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-এর ভাই ছিলেন। পূর্বেই এ প্রেক্ষিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মাআন (রা.) সত্তর জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মাআন (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবীতে লিখতে জানতেন, অথচ সে যুগে আরবী লিখার প্রচলন খুবই কম ছিল। হযরত মাআন (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সা.) হযরত মাআন বিন আদী (রা.) এবং যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৫, মাআন বিন আদী, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই আনসারদের কাছে চলুন। অতএব আমরা গেলাম আর তাদের মাঝে দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমরা পাই যারা বদরে'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি উরওয়া বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা ছিলেন যথাক্রমে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা (রা.) এবং হযরত মাআন বিন আদী (রা.)।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, বাব শহুদুল মালায়েকাহ বদর, হাদীস ৪০২১)

হযরত উমর (রা.)-এর যে রেওয়ায়েত এখনই বর্ণিত হয়েছে, এর আরো বিস্তারিত বুখারীর অপর এক বর্ণনায়ও উল্লিখিত আছে, যার কিছু অংশ আমি এখন উপস্থাপন করছি:-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাজেরদের অনেককে তিনি কুরআন পড়াতেন। তাদের মাঝে আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)ও ছিলেন। একবার তিনি তার সেই ঘরে অবস্থান করছিলেন, যেটি মিনায় অবস্থিত আর তিনি উমর বিন খাত্তাব (রা.)এর কাছে গিয়েছিলেন। এটি হযরত উমর (রা.)-এর শেষ হজ্জের ঘটনা। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) তার কাছে ফিরে এসে বলেন, হায়!

তুমিও যদি সেই ব্যক্তিকে দেখতে যে আজ আমীরুল মু'মিনিনের কাছে আসে এবং বলে, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনি কি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, যে বলে উমর (রা.) মারা গেলে আমি অমুকে'র হাতে বয়আত করব, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালেই বলছে যে, তার পর আমি অমুকের হাতে বয়আত করব। এরপর সেই ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত তো এমনিতেই তাড়াহুড়োয় হয়ে গেছে। শুধু এটি নয় যে, পরবর্তী জনের কথা উল্লেখ করেছে বরং এটাও বলে বসেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত নাউযুবিল্লাহ্ হাঙ্গামী পরিস্থিতিতে ভুলবশত হয়েছিল আর এভাবেই নাকি তিনি খেলাফতের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষের সামনে দণ্ডায়মান হব এবং তাদেরকে সেসব লোকের বিষয়ে সতর্ক করব যারা তাদের বিষয়কে জোর করে নিজেদের হাতে নিতে চায়। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এমনটি করবেন না। কেননা হজ্জে সাধারণ মানুষ এবং দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও সমবেত হয়ে থাকে। আপনি যখন মানুষের মাঝে কিছু বলার জন্য দাঁড়াবেন, তখন এরাই জোর করে আপনার কাছে ভিড়বে বা একত্রিত হবে। আর আমার আশংকা হয়, আপনি দাঁড়িয়ে এমন কোন কথা না বলে বসেন যে আপনি বলবেন কিছু আর অপপ্রচারকারীরা প্রচার করবে ভিন্ন কিছু (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে অন্য কিছু প্রচার করবে আর মানুষ তা বুঝতেও পারবে না এবং যথাস্থানে তা প্রয়োগও করবে না)। অর্থাৎ কথা বুঝবেও না আর সঠিক স্থানে তা প্রয়োগও করতে পারবে না এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হবে না। এভাবে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ প্রদান করেন আর বলেন, মদিনায় পৌঁছা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। তখন হজ্জের সময় ছিল। আপনি যদি মদিনায় পৌঁছে এমন কিছু বলেন, যা কিনা হিজরত এবং সুন্নতের স্থান, সেখানে যা হবে তা হলো, বুদ্ধিমান ও ভদ্র লোকদেরকে আলাদা করে তাদেরকে আপনার যা বলার তা প্রশান্তচিত্তে বলুন। তিনি বলেন, আমি বললাম, জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথা বুঝতে পারবে আর যথোপযুক্ত স্থানে তা প্রয়োগও করবে এবং নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে না। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে, খোদার কসম! ইনশাআল্লাহ্ সেখানে পৌঁছে প্রথমবার খুতবা প্রদানের জন্য আমি যখন মদিনায় দণ্ডায়মান হব, তখন এই কথাগুলো বর্ণনা করব। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমরা যিল হজ্জ মাসের শেষের দিকে মদিনায় পৌঁছি। জুমুআর দিন সূর্য ঢলে পড়তেই (অর্থাৎ জুমুআর সময় হতেই) আমরা দ্রুত মসজিদে এসে যাই। সেখানে পৌঁছেই আমি সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)কে মিম্বরের পাশে বসা অবস্থায় দেখতে পাই এবং আমিও তার পাশে বসে যাই। আমার হাঁটু তার হাঁটু স্পর্শ করছিল (তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন)। স্বল্পক্ষণ অতিবাহিত হতেই হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) খুতবার জন্য বের হন। আমি যখন তাকে সম্মুখ দিক থেকে আসতে দেখি, তখন আমি সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)কে বলি, আজ তিনি এমন কথা বলবেন যা খলীফা হওয়ার পর থেকে কখনও বলেন নি। আমার কথা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয় (অর্থাৎ যেই সাহাবী তার পাশে বসে ছিলেন তার কাছে সেকথাগুলো অদ্ভুত ঠেকে)। তিনি বলেন, আমি মনে করি না যে, তিনি এমন কথা বলবেন যা এর পূর্বে তিনি বলেন নি।

হযরত উমর (রা.) মিম্বরে বসেন। মুয়াযযিন আযান শেষ করলে তিনি দণ্ডায়মান হন আর আল্লাহ্‌র সেই প্রশংসা করেন, যার তিনি যোগ্য। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলতে যাচ্ছি যা আমার জন্য বলা অবধারিত ছিল। আমি জানি না, এই কথা আমার মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী কথা কি না। তাই যে ব্যক্তি এ কথাকে বুঝবে এবং ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, এমন ব্যক্তির উটনী তাকে যেখানেই পৌঁছে দেয় সে যেন সেই কথা বর্ণনা করে (অর্থাৎ এই কথাকে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব সেখানেই যেন অন্যের মাঝে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়) আর যার এই সন্দেহ হয় যে, সে এই কথা বুঝে নি, সে ক্ষেত্রে আমার সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলাকে আমি বৈধ মনে করি না (অর্থাৎ ভ্রান্ত কথা প্রচার করবে না)। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর (সা.) ওপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ করেন। এরপর শরীয়তের কতক আদেশ-নিষেধের কথাও উল্লেখ করেন। (এটি এক দীর্ঘ বর্ণনা এবং হাদীস, এটিকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।) অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, শোন! এরপর মহানবী (সা.) এটিও বলেছিলেন যে, যেভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, সেভাবে আমার অতিরঞ্জিত প্রশংসা করো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, তোমরা বরং আমার সম্পর্কে এটিই বল যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল (সা.)। অতঃপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলে, আবু বকর (রা.) তো এমনিতেই খেলাফত পেয়ে গেছেন। সেই ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.) সম্বন্ধেও এবং আমার সম্বন্ধেও বলেছে যে, খোদার কসম! উমর যদি মারা যায় তবে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বয়আত করবো। তিনি কথা প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে নিয়ে গেছেন পরবর্তীদের বিষয় তো পরে আসবে। এ বিষয়টি আমি স্পষ্ট করছি, কোন ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার বশবর্তী হয়ে যেন এ কথা না বলে যে, আবু বকর (রা.)-এর বয়আত এমনিতেই হাঙ্গামী পরিস্থিতিতে ভুলে হয়ে গিয়েছিল আর এভাবে তিনি খলীফা হয়ে যান। শোন! এটি সঠিক যে, সেই বয়আত এভাবেই হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাড়াহুড়োর বয়আতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা

করেছেন। তা তাড়াহুড়োর অবস্থায় হয়ে থাকলে হয়ে থাকবে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এর ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন। আর তোমাদের মাঝে আবু বকর (রা.)-এর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই যার কাছে উটে চড়ে মানুষ আসবে। অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্মশীল আলেম, নিষ্ঠাবান এবং তাক্বওয়ার উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অন্য কেউ ছিল না। এরপর অন্যান্য কথার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোন ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করে তার হাতে যেন বয়আত করা না হয় অর্থাৎ, যে বয়আত হয়েছিল তা যথার্থ পরামর্শের মাধ্যমেই হয়েছিল। আর এটিও স্মরণ রেখ, যে ব্যক্তি মুসলামানদের পরামর্শ ছাড়াই কোন ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করে তার বয়আত যেন না করা হয় এবং সেই ব্যক্তিরও (হাতে যেন বয়আত না করা হয়) যে কিনা তার হাতে বয়আত করেছে এটি এজন্য যে, সে যেন নিজেকে ধ্বংস না করে ফেলে।

এরপর হযরত উমর (রা.) প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন, সত্যিকার অর্থে আমাদের ঘটনা মূলত এটি হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-কে মৃত্যু দেন তখন আনসারগণ আমাদের বিরোধী হয়ে যায় এবং আমরা সবাই সাকীফা বনূ সায়েদা-য় একত্রিত হই। হযরত আলী (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) আর যারা তাদের সাথে ছিল তারা সবাই আমাদের বিরোধী ছিল। মুহাজিরগণ তখন একত্রিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসে। আমি আবু বকর (রা.)-কে বললাম, হে আবু বকর (রা.)! চলুন, আমরা আনসার ভাইদের নিকট যাই। তাদের সেই ঘটনা বর্ণনা করতে করতে এবং সেই কথা বলতে বলতে আমরা যাচ্ছিলাম যে, তারা কী কথা বলছে? আমরা যখন তাদের নিকটে পৌঁছি তখন তাদের মধ্যকার দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রথমে যে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছিলাম, সে অনুযায়ী যে দু'জন পুণ্যবান পুরুষ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত মাআন বিন আদী (রা.)। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন-যে পরামর্শের ওপর সেসব লোক (অর্থাৎ আনসারগণ) ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসেছিল, পথে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সেই দুই ব্যক্তি আনসারদের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করে, হে মুহাজেরদের দল! তোমরা কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমরা বললাম, আমরা সেসব আনসার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। তখন সেই দু'জন (অর্থাৎ যাদের সাথে পথে দেখা হয়েছিল, যাদের মাঝে হযরত মাআন বিন আদী-ও ছিলেন) বলেন, কোন অবস্থাতেই সেখানে যেও না। তাদের কাছে না যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা পরামর্শ করতে চাও, নিজেরাই করে নাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাবো আর আমরা এটি বলে রওয়ানা হই আর বনু সায়েদার শামিয়ানায় তাদের কাছে পৌঁছি।

(সহিহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব রাজমুল হুবলা মিনায জিনাহ ইযা আহসানাত, হাদীস নং ৬৮৩০)

সেখানে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আনসারদের একটি দীর্ঘ বিতর্ক হয় আর যে আলোচনা হয়েছিল তা খিলাফতের নির্বাচন সম্বন্ধে ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যার কিছুটা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা উপস্থাপন করছি। সেই সাকীফা বনু সায়েদার ঘটনা যেখানে আনসাররা বসেছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালে সাহাবীরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল এটি মনে করল যে, মহানবী (সা.)-এর পরে এমন এক ব্যক্তি অবশ্যই হওয়া উচিত যে কিনা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু নবীদের ইচ্ছাকে যেহেতু তাদের পরিবার ও বংশধরগণই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তাই মহানবী (সা.)-এর বংশের মধ্য থেকেই কোন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা উচিত। একটি দল এটি বলছিল যে, তাঁর (সা.) সন্তানদের মাঝ থেকেই কেউ মনোনীত হওয়া উচিত অন্য কোন পরিবার থেকে নয়। এই দলটির ধারণা ছিল যে, অন্য কোন পরিবার থেকে যদি কোন ব্যক্তি খলীফা মনোনীত হয়, তাহলে মানুষ তার কথা মানবে না আর এভাবে ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। সন্তান বলতে আপন সন্তান বা তাঁর (সা.) নিকটাত্মীয় যেমন জামাতা প্রভৃতিও হতে পারেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, যদি তাঁর (সা.) পরিবার থেকেই কেউ খলীফা নির্ধারিত হন, তাহলে যেহেতু মানুষ এই পরিবারের আনুগত্যে অভ্যস্ত, তাই তারা সানন্দে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। যেমন একজন সম্রাটের কথা মান্য করতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, যখন সে মৃত্যুবরণ করে আর তার ছেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন তার আনুগত্যও মানুষ সানন্দে স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় যে দলটি ছিল তারা ভাবল যে, এর জন্য কারো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবারভুক্ত হওয়ার শর্তটি থাকা আবশ্যক নয়। উদ্দেশ্য হলো মহানবী (সা.)-এর একজন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হওয়া, তাই যিনি এর সবচেয়ে যোগ্য, তার ওপরই এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত। এই দ্বিতীয় দলের আবার দু'টো ভাগ হয়ে যায়; আর যদিও দু'দলই এই বিষয়ে একমত ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর একজন স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত কিন্তু তাদের মাঝে এটি নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা.)-এর এই স্থলাভিষিক্ত কাদের মধ্য থেকে হবেন। এক দলের মত ছিল– যারা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর (সা.) শিক্ষাধীন ছিলেন, তারা এর যোগ্য; অর্থাৎ মুহাজেরগণ, আর তাদের মধ্য থেকেও কেবল কুরাইশ বংশোদ্ভূত কেউ, যার কথা মানার জন্য আরব প্রস্তুত হতে পারে। আর কতক ভাবল যে, যেহেতু মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু মদিনায় হয়েছে এবং মদিনায় আনসারদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই তারা-ই এই দায়িত্ব উত্তমরূপে

পরিচালনা করতে পারবেন। যাহোক, এটি নিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে মতভেদও হয়েছে। মোটকথা, এভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। আনসারদের ধারণা ছিল, যেহেতু মহানবী (সা.) তাঁর আসল জীবন, যা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত, তা আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন (অর্থাৎ মদিনায় অতিবাহিত করেছেন) আর মক্কায় কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না, তাই শাসনব্যবস্থা আমরাই ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং খিলাফতের বিষয়ে আমাদেরই অধিকার বর্তায়, অন্য কারো নয়। দ্বিতীয় যে যুক্তি তারা দিত তা হলো, এই এলাকা আমাদের এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষের উপর আমাদের কথারই বেশি প্রভাব পড়তে পারে, মুহাজিরদের নয়। তাই মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত আমাদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, মুহাজিরদের মধ্য থেকে নয়।

এর বিপরীতে মুহাজিররা বলছিলেন, মহানবী (সা.)–এর দীর্ঘ সাহচর্য আমরা যতটা লাভ করেছি, ততটা দীর্ঘ সাহচর্য আনসাররা লাভ করে নি [এতটা সময় তারা তাঁর (সা.) সাথে থাকে নি] তাই ধর্ম বুঝার যে যোগ্যতা আমাদের রয়েছে, তা আনসারদের নেই। তিনি (রা.) লিখেন, এই দ্বিমত নিয়ে অন্যরা সবেমাত্র চিন্তা শুরু করেছে এবং তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি– এমন সময় শেষোক্ত দলটি, যারা আনসারদের পক্ষে ছিল, বনু সায়েদার এক বারান্দায় একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ শুরু করে দেয়। আর সাদ বিন উবাদা (রা.), যিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন এবং নকীবদের একজন ছিলেন, তার ব্যাপারে সবাই বলতে আরম্ভ করে যে, তাকে খলীফা মনোনীত করা হোক। অতএব আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় বলে, দেশ আমাদের, জমিজমাও আমাদের, বিষয়-সম্পত্তিও আমাদের আর ইসলামের মঙ্গলও এরই মাঝে নিহিত যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা মনোনীত হোক। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই পদের জন্য সাদ বিন উবাদা (রা.)-এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যক্তি নেই। এই আলাপচারিতা চলাকালীন কেউ কেউ বলে, যদি মুহাজিররা তাকে অস্বীকার করে তাহলে কী হবে? এরকম প্রশ্ন উঠল। এতে কেউ বলে, তখন আমরা বলব 'মিন্না আমীরুন ওয়া মিনকুম আমীর' অর্থাৎ একজন আমীর হোক তোমাদের মধ্য থেকে আরেকজন আমীর হোক আমাদের মধ্য থেকে। এতে সাদ, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, যাকে আনসাররা আমীর তথা খলীফা বানাতে চাইছিল, তিনি বললেন, এটা তো প্রথম দুর্বলতা (অর্থাৎ একজন খলীফা আমাদের মধ্য থেকে আর অপরজন তোমাদের মধ্য থেকে–এটি প্রথম দুর্বলতা)। 'মিন্না আমীরুন ওয়া মিনকুম আমীর' বলা তো খেলাফতের মর্মার্থ না বুঝারই নামান্তর আর এতে ইসলামে বিপত্তি দেখা দেবে। এই পরামর্শ সভার পর মুহাজেরগণ যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তারা দ্রুত সেখানে পৌঁছেন। [যেমনটি হযরত উমর (রা.) বলেছেন আর যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তিনি, হযরত আবু বকর (রা.) ও আরো কিছু লোক সেখানে যান]। কেননা তারা এ কথা জানতেন যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা না হলে আরবরা তার আনুগত্য করবে না আর এটি কেবল মদিনার বিষয় নয় বরং পুরো আরবের বিষয়। মদিনায় নিঃসন্দেহে আনসারদের আধিপত্য ছিল কিন্তু পুরো আরব মক্কাবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং মুহাজেরগণ মনে করলেন, এই সময় যদি আনসারদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা নির্বাচিত হন, তবে আরববাসীদের জন্য কঠিন সমস্যা দেখা দেবে আর এটিও সম্ভব যে, তাদের অধিকাংশই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে না। সুতরাং সকল মুহাজের যখন সেখানে উপস্থিত হন- যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, বর্ণনা করার জন্য তখন আমি অনেক বড় একটি বিষয় চিন্তা করে রেখেছিলাম আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি সেখানে গিয়েই এমন একটি বক্তৃতা দেবো, যা শুনে সকল আনসার আমার যুক্তি মেনে নিবে আর তারা এই কথা বলতে বাধ্য হবে যে, আনসারদের পরিবর্তে মুহাজেরদের মাঝ থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করা হোক। কিন্তু আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, তিনি আর কী-বা বলবেন। কিন্তু খোদার কসম! আমি যত কথা ভেবেছিলাম হযরত আবু বকর (রা.) সেই সমস্ত কথা বলে দেন বরং এছাড়াও নিজের পক্ষ থেকে তিনি বেশ কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর মোকাবেলা করার সামর্থ্য তখন রাখি না। এককথায় মুহাজিরগণ তাদেরকে বলেন যে, এই মুহূর্তে কুরাইশদের মধ্য থেকেই আমীর হওয়া আবশ্যক এবং মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসটিও তিনি উপস্থাপন করেন যে, 'আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ' অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম হওয়ার কথা। একই সাথে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামীতা এবং ধর্মের খাতিরে তারা যে কুরবানী করে আসছেন তাও উল্লেখ করেন। এতে হুব্বাব বিন মুনযের খাযরাজী দ্বিমত পোষণ করে বলেন, আমরা এই কথা মানি না যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে খলীফা হওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি কোনভাবেই একমত না হন এবং এই কথার ওপর আপনারা যদি জোর দেন তাহলে একজন আমীর হোক আপনাদের মাঝ থেকে আর আরেকজন আমীর হোক আমাদের মধ্য থেকে। [এই কথার ওপর আমল করা যেতে পারে যে, একজন খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে আর একজন আপনাদের মধ্য থেকে।] হযরত উমর (রা.) বলেন, ভেবেচিন্তে কথা বল। তুমি কি জানো না যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, একই সময়ে দু'জন আমীর হওয়া কোনভাবে বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্

মওউদ (রা.) লিখেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, এমন হাদীসও বিদ্যমান ছিল যাতে মহানবী (সা.) খিলাফতের ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতে সাহাবীদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি আর এর নেপথ্য কারণ ছিল সেই ঐশী প্রজ্ঞা, যার উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের এই বর্ণনায় প্রদান করেছেন আর যা এই মুহূর্তে উল্লেখ করা হচ্ছে। যাহোক, হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার এই দাবি যে, একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হোক আরেকজন আমাদের মধ্য থেকে; যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কোনভাবেই বৈধ নয়।

এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন কিভাবে হলো? কিছু তর্ক-বিতর্কের পর হযরত আবু উবায়দা (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং তিনি আনসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা সেই প্রথম জাতি, যারা মক্কার বাহিরে ঈমান এনেছে। এখন মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে তোমরা সেই প্রথম জাতিতে পরিণত হয়ো না, যারা ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবে। তিনি বলেন, সকল প্রকৃতির মানুষের ওপর এই বক্তব্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, বশীর বিন সাদ খাযরাজী উঠে দাঁড়ান এবং স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেন, তারা সত্য কথা বলেছেন। আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে সেবা করেছি এবং তাঁকে (সা.) যে সাহায্য সহযোগিতা করেছি, তা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে করি নি আর এ কারণেও করি নি যে, তাঁর পর আমরা রাজত্ব লাভ করব, বরং আমরা খোদা তা'লার খাতিরে করেছিলাম। অতএব এখানে অধিকারের প্রশ্ন নয় যে, অধিকার আমাদের, আমরা আমীর হবো বা আমাদের মধ্য থেকে খলীফা হবে! বরং এটি ইসলামের প্রয়োজনের প্রশ্ন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাজেরদের মধ্য থেকেই আমীর নিযুক্ত হওয়া উচিত, কেননা তারা মহানবী (সা.) এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছেন। এতে আরো কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে আধা বা পৌনে এক ঘন্টা পর মানুষ একথার পক্ষে মত দিতে থাকে যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত। সুতরাং এই পদের জন্য হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর নাম প্রস্তাব করা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং এটি উপস্থাপন করেন যে, হযরত উমর (রা.) বা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মধ্য থেকে কারো হাতে বয়আত করা উচিত। কিন্তু উভয়েই অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যাকে মহানবী (সা.) স্বীয় অসুস্থতার সময় নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন এবং যিনি সকল মুহাজেরদের মাঝে উত্তম, আমরা তাঁর হাতেই বয়আত করব।

হযরত আবু বকর (রা.) যে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নাম খিলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন সে সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং তাঁর কথার ধারাবাহিকতায় বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) জোরালো বক্তৃতা করেন, সব কথাই তার অনেক উন্নত মানের ছিল, তবে এই একটি কথা ছাড়া (অর্থাৎ হযরত উমর ও আবু উবায়দার নাম উপস্থাপনের বিষয়টি ছাড়া) আমি আর কোন কথা অপছন্দ করি নি। তিনি বলেন, খোদার কসম! হযরত আবু বকর (রা.) যখন আমার নাম উপস্থাপন করেন তখন আমার অবস্থা এমন ছিল যে, মৃত্যু যাতে আমাকে পাপের কাছে যাওয়া হতে রক্ষা করে, এমানসে আমাকে সামনে নিয়ে গিয়ে যদি আমার শিরোচ্ছেদ করা হতো তাহলেও এটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় ছিল এর চেয়ে যে, আমি এমন জাতির আমীর হব যাদের মাঝে হযরত আবু বকর রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর পদমর্যাদা এমন যে, এটি কীভাবে হতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর বর্তমানে আমাকে আমীর বানানো হবে? তাই আমি তা অপছন্দ করি। এটি ছাড়া বাকি বক্তৃতা ছিল খুবই উন্নত।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন বলেন, মুহাজেরদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, আমরা তাঁর হাতে বয়আত করব- এর অর্থ ছিল, এ পদের জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব একথার পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করা আরম্ভ হয়। প্রথমে হযরত উমর (রা.) বয়আত করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা (রা.) বয়আত করেন। এরপর বশীর বিন সাদ খাযরাজি বয়আত করেন। আর এরপর অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা বয়আত করে। তখন সাদ, যিনি অসুস্থ ছিলেন এবং উঠার শক্তি ছিল না, তার জাতির লোকেরা এমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিসহ্যে তাকে ডিঙিয়ে অগ্রসর হয়ে বয়আত করছিল। সুতরাং অল্প ক্ষণের ভেতর সাদ (রা.) ও হযরত আলী (রা.) ব্যতীত সবাই বয়আত করে নেয়, এমনকি সাদ (রা.)-এর পুত্রও বয়আত করে নেয়। হযরত আলী (রা.) কিছুদিন পর বয়আত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন দিন উল্লেখ হয়েছে আর কোন কোন রেওয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, ছয় মাস পরে তিনি বয়আত করেছিলেন। ছয় মাসের উল্লেখ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করতে পারেন নি আর যখন তিনি বয়আত করতে আসেন তখন এই বলে ক্ষমাও চান যে, ফাতেমা (রা.) যেহেতু অসুস্থ ছিলেন, তাই আমার বয়আত করতে বিলম্ব হয়েছে।

(খিলাফতে রাশেদা, পৃ: ৩৯-৪২, আনওয়ারুল উলুম, ১৫তম খণ্ড)

যাহোক, তখন সবাই বয়আত করে।

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা

করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মৃত্যু দেন তখন মানুষ মহানবী (সা.)-এর জন্য কাঁদতে থাকে এবং তারা বলতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (সা.)-এর পূর্বেই আমরা মারা যাওয়া পছন্দ করতাম। আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর (সা.) পর কোথাও আবার আমরা ফিতনায় না নিপতিত হই। হযরত মাআন (রা.) অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন আকাঙ্ক্ষা করতাম না। মানুষ এটি বলছিল যে, আমরা যদি পূর্বে মৃত্যু বরণ করতাম ভাল হতো কিন্তু হযরত মাআন (রা.) বলেন, না, আমি এটি চাইতাম না যে, আমি মহানবী (সা.)-এর পূর্বে মৃত্যু বরণ করব- আর তা কেন? তা এ জন্যই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও সেভাবে তাঁর (সা.) সত্যায়ন না করতে পারছি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমি তাঁর (সা.) সত্যায়ন করেছি।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৫, মাআন বিন আদী, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

যেভাবে আমি তাঁকে (সা.) নবী মেনেছি অনুরূপভাবে তাঁর (সা.) মৃত্যুর পরও এই বিষয়ের সত্যায়ন না করব যে, খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাপনার যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (সা.) করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং মুনাফিক ও মুরতাদদের ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

সুতরাং এটি হলো ঈমানের সেই মানদণ্ড, যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের দমনে হযরত মাআন (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দু'শত অশ্বারোহীর সাথে হযরত মাআনকে অগ্রবাহীনি হিসেবে ইয়ামামায় প্রেরণ করেছিলেন।

(আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫১, মাআন বিন আদী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে হযরত মাআন (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৪, মাআন বিন আদী, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

সকল আহমদীকেও আল্লাহ্ তা'লা নবুওয়তের পদমর্যাদা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক স্থাপনেরও তৌফিক দিন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ: ৫-৯)

পাঁচবেলার নামায

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

দীনের নবী মেরাজ হতে যখন ফিরে এলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

ফজর যোহর আসর আর মাগরিব ও ইশা
মেরাজ পাবে তোমরাও যদি থাকে তাতে নেশা,
খোদা দেখার আয়না নামায, জানান দিয়েছিলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

পাঁচ হালতে পাঁচটি নামায ফরজ করেন আল্লাহ্
এই নামাযে হতে হবে তোমায় ফানাফিল্লাহ,
ওয়াস্তাইনু বিসসাবরি ওয়াসসালাত-এ বলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

তসবিহ তাহমিদ তাকদিস দুরুদ আর ইস্তিগফার
পঞ্চতন্ত্রের সংমিশ্রণে নামায-- কী চাই আর!!
আল্লাহর রাসুল আল্লাহর মাঝে একাকার হলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

আদালতের সমন জারি যেমন মানুষের
শান্তি নষ্ট করার শুরু-- মধ্য দিবসের,
সূর্য হেলে পড়ার সময় যোহর বুঝাইলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

গ্রেফতার হইয়া হাকিমের সামনে যখন আসি
নাই আশা নাই প্রাণে তখন আসর-ওয়াক্ত দেখি,
ডুবন্তপ্রায় সূর্যের মত ক্ষীণ আশা হেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

সাক্ষী প্রমাণ বিচার আচার আমার বিরুদ্ধে
কয়েদীভাবে দেখলাম আঁধার মাগরিব ওয়াক্তে,
আর আশা নাই আর আশা নাই বাতি নিভাইলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

ঘন অন্ধকার-- কারাগার, করে আচ্ছাদন
ইশার সময় এমনই ভাব করে বিরাজন,
মুক্তি চাই হে আল্লাহ মাবুদ! দোয়া জানালেম
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

জেল খাটিয়ে আংড়া হইয়া হইলে পরে খাঁটি
আল্লাহ মাবুদ দয়ার সাগর জেল হতে দেন ছুটি,
ফজরে তাই আল্লাহ ঊষার আলো ফুটালেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

এই হল পাঁচ হালৎ মনের পাঁচ নামাযের মাঝে
বিরাজিত বুঝতে যদি দুনিয়াদারির কাজে,
একীনের নূর বিলাইতে দ্বীনের নবী এলেন
উম্মতেরে ডেকে তিনি পাঁচটি নামায দিলেন ॥

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়েমজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা সমাপ্ত করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৬,১০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারীদের এক সমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে দিতে হবে যে খোদা তা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম"

- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (আহমদীয়া মুসলিম যুব সংঘের) তিন দিনব্যাপী জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) এর সমাপনীতে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।

তৃতীয়বারের মতো কিংসলির কান্ট্রি মার্কেটে অনুষ্ঠিত ইজতেমার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল মুসলিম যুবকদের ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম এবং দেশের সেবায় যথাসাধ্য নিবেদিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

এ বছরের ইজতেমার থিম ছিল 'খোদাতা'লার অস্তিত্ব'। সমাপনী ভাষণে সম্মানিত হুযূর বিস্তারিতভাবে নিজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করেন।

ইজতেমার ন্যায় ধর্মীয়সমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়েহযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের জলসা এবং ইজতেমাসমূহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন সমবেত হয়েনিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের সর্বদা নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ বিষয়হল, ইজতেমা অংশগ্রহণের ফলে সকল অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আল্লাহ্

তনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি প্রত্যেক খাদেম (যুবক সদস্য) এ বিষয়ে মনোযোগী হয় তবে এটি তাকে খোদা তা'লার আদেশাবলী পালন করার এবং অনৈতিকতা ও পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করবে।"

সম্মানিত হুযূর জোর দেন যে, বৃহত্তর পরিসরে বিশ্বের সংশোধনের প্রয়াসের পূর্বে ব্যক্তিগত সংশোধন অত্যাবশ্যক, নতুবা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্লোগানটি

"সমাজের কল্যাণ সাধনের এর পরিবর্তে বৃথা ও অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম মন্ত্রে"

পরিণত হবে।

সম্মানিত হুযূর আলোচনা করেন কিভাবে মানুষ বড় সংখ্যায় ধর্মকে পরিত্যাগ করছে, এবং সাধারণভাবে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছে।

সম্মানিত হুযূর যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের প্রশ্ন ও যুক্তিসমূহের উত্তর প্রদানে আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে যে ভূমিকা রাখতে হবে তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে দিতে হবে যে খোদা তা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এ প্রয়াসে আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবেন না বা এই বাণী পৌঁছানোকে অন্যদের কাজ মনে করবেন না। নিশ্চিতভাবে, আহমদী মুসলিম যুব সমাজকে এ প্রয়াসে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং আমাদের সময়ের এই মহান চ্যালেঞ্জকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।"

সম্মানিত হুযূর এর পরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাদের আত্মত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতার মান তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণ সেই সম্মানিত জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা কেবল তাদের ধর্মকে সমুদয়পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকারই করেন নি, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়হলো, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে সর্বাধিক বিস্ময়কর ভাবে পূর্ণ করেছেন। তাঁরা তাদের অঙ্গীকার পূরণে কোন সুযোগ অপূর্ণ রাখেন নি এবং ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করেছেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে অসাধারণ উন্নতির তৌফিক দান করেছেন। একই

সাথে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও কল্যাণমণ্ডিত করেছেন ... এমনভাবে যে, তাদের কেউ কেউ আজকের পরিভাষায় 'কোটিপতি'তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু, সেই সম্পদ কখনো তাঁদেরকে তাঁদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায় নি বা তাঁদেরকে পদস্খলিত করে নি।"

'ইস্তেগফার'-এর দর্শন ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার কাছে কেবল অতীত ভুলত্রুটি ও পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা চাওয়া ইস্তেগফারের পদ্ধতি না। কেবল অতীতের দিকে নয় বরং ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো উচিত। সুতরাং আপনাদের পূর্বের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় ভবিষ্যতে এমন পাপ সমূহ থেকে দূরে থাকার জন্যও আপনাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি কুরআনের ভাষায় 'আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো' এ দোয়ার মাধ্যমে খোদাতালার সাহায্য চাওয়া উচিত।

এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ দোয়া পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে এবং তাকওয়ার পথে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত আর যে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ডেকে আনে এমন অবৈধ ও শঠতাপূর্ণ আচরণের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার দিকে সর্বদা প্রলুব্ধ করতে থাকে, তার আক্রমণসমূহকে অস্বীকার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

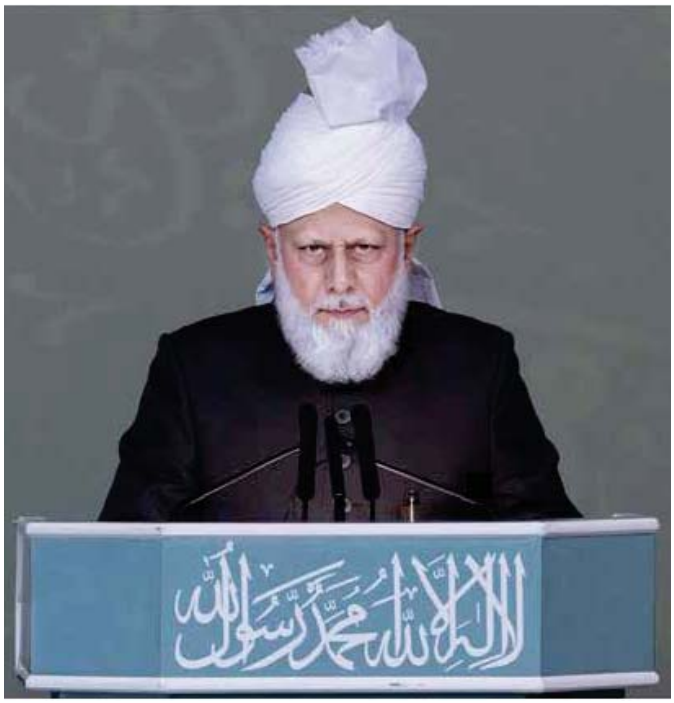

"অতএব প্রত্যেক আহমদী মুসলিমের - পুরুষ বা নারী, তরুণ বা বৃদ্ধ - মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার পর এবং ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার করার পর, বারবার এ দোয়া করা উচিত যেন সঠিক হেদায়াতের পথে থাকতে পারেন।"

ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয়া প্রসঙ্গে সম্মানিত হুযূর উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের আজকের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী বিপদাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, এ যুগে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সমাজ শয়তানী প্রভাবসমূহের দ্বারা প্লাবিত হয়ে আছে। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি, মাদক, অনলাইন গেমিং, জুয়া, অনৈতিক ও অশোভন সম্পর্ক, নাইটক্লাবে যাওয়া এ সকল শয়তানী অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো কেবলই ক্ষতিকর এবং যেগুলো খোদা তা'লার নিকট হতে মানুষকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।"

সম্মানিত হুযূর আরো ব্যাখ্যা করেন যে, কেবলমাত্র খোদা তা'লার দিকে প্রকৃত নিষ্ঠার সাথে ঝুঁকার মাধ্যমেই নাজাত (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন যে এমনকি খোদাতা'লার নবীগণও, তাদের পূত পবিত্র চরিত্র সত্ত্বেও খোদা তা'লার কাছে ক্ষমার জন্য দোয়ারত থেকেছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি মহান নবীগণেরও মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কীইবা বলা যেতে পারে? নিশ্চয় কেবলমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকা এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ যাচনা করার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি সঠিক পথে থাকতে পারে।"

সম্মানিত হুযূর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের পরামর্শ দেন তারা যেন সমাজ জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"(তারা যেন) সত্য সত্যই অনুধাবন করেন যে, তাদেরকে তাদের জাতির সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেই সকল সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা সারা বিশ্বকে খোদা তা'লার তৌহিদের বিশ্বাসে একতাবদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

এরপর, সম্মানিত হুযূর এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেনযে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তরুণ সদস্যগণ যেন তাদের ঈমানে দৃঢ় ও ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি আমার একান্ত হৃদয়-নিঙড়ানো দোয়া যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ও আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ যেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধকে লালন ও সংরক্ষণ করেন এবং অনুধাবন করেন যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের মূল পরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার উপরই তাদের প্রতিটি সফলতার ভিত্তি রচিত হবে।"

সম্মানিত হুযূর নিম্নের দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ঈমানোদ্দীপক ভাষণ সমাপ্ত করেন:

"আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হৃদয়ে যেন মহত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপনারা যেন সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রেখে আপনাদের জীবন যাপন করেন। আপনারা আপনাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি ক্ষণে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী হন। আমীন।"

ইজতেমায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৪০টির অধিক স্থানীয় শাখা (কিয়াদাত) থেকে ৬,১০০ এর অধিক আহমদী মুসলিম যুবক অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও জ্ঞানগত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, যার মধ্যে প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় সকলকে একাত্ম করার জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'দর্শক ভোট'।

সমবেত মুসলিম যুবকদের জন্য আরো একটি বিশেষ সুযোগ এবার ছিল যেখানে 'দি হাব'-এ গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একান্ত পরিবেশে তারা তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন।

চলে গেলেন বাঙালি প্রেমিক এডভোকেট মুজিবুর রহমান

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

এডভোকেট মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের রাবওয়ায় গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি বাংলা মায়ের এক কৃতি সন্তান। তার পৈত্রিক ঠিকানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের অদূরে তিতাস নদীর বাঁকে কাসাইট গ্রামে। তার দাদা ক্বারী নঈম উদ্দিন সাহেব ছিলেন সেকালের ত্রিপুরা জেলার একজন প্রখ্যাত আলেম, সুললিত কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকারী ক্বারী এবং মানুষকে খোদার আশেকে আবেগাপ্লুত করে তোলার হৃদয়গ্রাহী সুবক্তা।

মুজিবুর রহমান সাহেবের পিতা আল্লামা জিল্লুর রহমান জামাতে আহমদীয়ার এক খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি হযরত হাফেয রৌশন আলী (রা.) এবং খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলীর তবলীগে ১৯১৬ সালে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তখন তাঁর সহোদর ছোট ভাই সূফী মুতিউর রহমানও বয়আত করেন। দুই ভাই আহমদীয়াত গ্রহণে আলেম পিতা ক্রোধান্বীত হন। আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী তাদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং তাদের গ্রাম ছাড়ার আন্দোলন শুরু হয়। তাঁরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অবশেষে বঙ্গীয় আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পরামর্শক্রমে ভ্রাতৃদ্বয় ১৯১৭ সালে কাদিয়ান চলে যান।

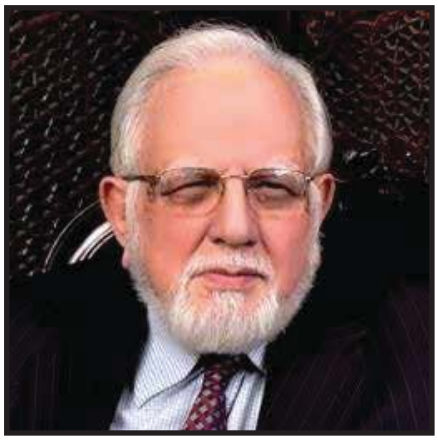

এডভোকেট মুজিবুর রহমান

১৯১৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যিন্দেগী ওয়াকফের তাহরীক করলে জিল্লুর রহমান সাহেব যিন্দেগী ওয়াকফ করেন এবং হযরত হাফেয রৌশন আলী (রা.)-এর নিকট মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জামাতের একজন মোবাল্লেগ হন। অত:পর তিনি অবিভক্ত বাংলায় ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মোবাল্লেগ হিসেবে দক্ষতার সাথে জামাতের খেদমত করেছেন। এর ফলে আলেম পিতার সন্তান মুজিবুর রহমান শৈশব থেকে আহমদীয়া জামাতের তালিম-তরবিয়ত লাভে ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন।

উপরন্তু তাঁর পিতা সন্তানদেরকে কাদিয়ানের আলো-বাতাসে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ১৯৩৪ সালে পরিবারকে কাদিয়ান নিয়ে যান। এভাবে মুজিবুর রহমান সাহেব সহোদর ভাইবোনদের সাথে কাদিয়ানে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর তারা কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানের চিনিউট চলে যান এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

জিল্লুর রহমান সাহেবের ছিলেন দশ সন্তান। তন্মধ্যে দুই কন্যা শৈশবে মারা যান। বাকী চার ছেলে ও চার মেয়ে হলেন– ১। আতাউর রহমান, ২। এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ৩। সাইফুর রহমান, ৪। হামিদুর রহমান, ৫। হাবীবা আক্তার, ৬। হাসিনা আক্তার, ৭। আয়েশা ইশরাত এবং ৮। সাদেকা মুশাররাত।

শিক্ষা সমাপ্তির পর মুজিবুর রহমান সাহেব প্রথমে পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। পরে আইন-ব্যবসায় জড়িত হয়ে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট হিসেবে কাজ করেন এবং একজন খ্যাতনামা আইনজীবি হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক আহমদীয়া জামাত বিরোধী অর্ডিন্যান্স জারি করলে পাকিস্তানের হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে জামাতের বিশেষ বিশেষ মামলাগুলির ক্ষেত্রে মুজিবুর রহমান সাহেব আইনী-লড়াই করেন। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তিনি আহমদীদের ওপর আরোপিত অর্ডিন্যান্সকে অ-ইসলামিক ও মানবাধিকার-বিরোধী বলে আদালতে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন

এবং আহমদীদের ওপর পাকিস্তান সরকারের যে রোষানল তা দেশ-বিদেশে তোলে ধরেন। এছাড়াও **'ইসলামে মানবাধিকার'** এ বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোকপাত করেন।

এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব রাওয়ালপিন্ডি জামাতের আমীর হিসেবে দীর্ঘ ১৮ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে প্রথম যে প্রতিনিধি-দল রাবওয়া থেকে ঢাকায় প্রেরণ করেন, তাদের মধ্যে এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবও ছিলেন। সেই প্রতিনিধি দলের অন্যান্যরা হলেন– মাওলানা আব্দুল মালেক খান, জনাব মির্যা আব্দুল হক এবং জনাব জহুর আহমদ। অতঃপর নাড়ীর টানে প্রায় প্রতিবছরই তিনি জলসা উপলক্ষ্যে ঢাকায় চলে আসেন এবং জলসায় আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জ্ঞানগর্ব ভাষণ প্রদান করেন। তার বক্তব্য ছিল খুবই প্রাণবন্ত, যাতে বাংলাদেশ ও বাঙালি আহমদীদের প্রতি তার গভীর হৃদতা পরিস্ফুটিত হয়। রসিকতা করে তিনি বলতেন– 'আমার রক্ত বাঙালির এবং খাদ্য পাকিস্তানী। আমি মুসলমান নবায়ন করার জন্য বাংলাদেশে চলে আসি'। তার চাচা সূফি মুতিউর রহমান ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় মিশনারী হিসেবে জামাতের খেদমতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

মাতা-পিতার প্রতি মুজিবুর রহমান সাহেবের ছিল গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা ও দোয়া। তাই পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে **'আল্লামা জিল্লুর রহমান ফাউন্ডেশন'** প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার রচিত **'হাদীসুল মাহদী'** গ্রন্থটির তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং পিতার জীবন-স্মৃতির ওপর **'আল্লামা জিল্লুর রহমান'** নামে একটি পুস্তক রচনা করে তা প্রকাশ করেছেন। **'ইসলামে মানবাধিকার'** নামের পুস্তকটি তারই রচিত। এ পুস্তকগুলি জামাতের অমূল্য সম্পদ।

মুজিবুর রহমান সাহেব তার চাচা বজলুর রহমানের মেয়েকে বিবাহ করেন। তিনি তিন পুত্রের জনক ছিলেন। সন্তানরা হলেন– ১। এডভোকেট আজিজুর রহমান ওয়াকাশ, ২। ডা. আতাউর রহমান মায এবং ৩। খলিলুর রহমান হাম্মাদ। স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তিনি ২০০২ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডা: আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতনী ও জনাব সৈয়দ বশির আহমদ শাহ সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন।

বাঙালি আহমদী ছেলেদেরকে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় অধ্যয়ন এবং জামাতের খেদমতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাই কোন বাঙালি ছেলে জামেয়ায় ভর্তি হলে তিনি খুবই খুশী হতেন, আদর করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্নেহভাজন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ বাংলাদেশ তার স্মৃতিচারণে বলেন–

এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে যদিও ১৯৭৯ সালে প্রথমবার ঢাকায় দেখা হয়েছিল, কিন্তু পরিচয় গভীর হয়নি। বাংলাদেশের জলসায় তাঁর বক্তব্যের কথা মনে আছে। জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হবার দু'বছর পর তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় ১৯৮২ সালে দারুয্ যিয়াফতে (জামাতের অতিথিশালায়)। জলসায় আগত বাংলাদেশী অতিথিদের সাথে দেখা করতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেবার রাবওয়ায় কেন্দ্রীয় জলসায় তাঁর বক্তৃতা ছিল। মনে আছে, ওয়াকফের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ভাল বংশের ভাল ছেলেদের ওয়াক্‌ফের অধীনে আসা উচিত। পিতামাতারা যেন আল্লাহ্‌র পথে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট উপহারটি উপস্থাপন করেন।" এরপর বহুবার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। প্রথম থেকেই তাঁর স্নেহ ও উৎসাহ আমাকে উদ্বেলিত করেছে। ১৯৮৮ সালে পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরেছি। এরপর যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, নিজ দেশে তাঁকে ছুটে আসতে দেখেছি। আমাদেরকে হাতে করে তিনি তিনি গণসংযোগের কাজ শিখিয়েছেন এবং পদে পদে উৎসাহ যুগিয়েছেন। জ্ঞানী, জ্ঞান-পীপাসু একজন মুরব্বীকে হারিয়ে আজ আমিসহ অনেকেই ব্যাথায় কাতর। আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রিয় মানুষটিকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন, আমীন।

আমি তাঁর নিকট থেকে অনেক স্নেহ ও দোয়া পেয়েছি। ঢাকায় আসলে সাক্ষাতে তিনি অনেক আদর করতেন এবং জামাতের লেখালেখির জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। বাংলা পড়তে না পারলেও তিনি আমার রচিত জামাত থেকে প্রকাশিত পুস্তক পাকিস্তানে নিয়ে যেতেন। সর্বশেষ ২০১৭ সালে তিনি বাংলাদেশ জামাতের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ঢাকা আসেন। তখন মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর জনাব আহমদ তবশির চৌধুরীর বাসায় নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে অনেক আলাপ হয়। তখন আমি সবিনয়ে বলি– আপনি আর পাকিস্তানে না গিয়ে বাংলাদেশে থাকুন। কেননা, বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করলে মুসলমান হয়ে মারা যাবেন। কিন্তু পাকিস্তানে মারা গেলে সরকারী ভাবে অমুসলমান হয়ে মারা যাবেন।

তিনি ছিলেন বাংলাদেশ এবং বাঙালি আহমদীদের প্রাণের মানুষ, এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার জামাতের খেদমত দেশ-বিদেশে খুবই প্রশংশিত হয়। তার মৃত্যুতে জামাত এক বীর বাঙালি লড়াকু সেনানী হারিয়েছে। তাই তার মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৯ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ জুমুআর খুতবায় তার যিকরে খায়ের করেন এবং গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়ান। হুযূর (আই.) বলেন–

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকাররম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের, যিনি গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে রাবওয়ায় তাহের হার্ট

ইন্সটিটিউট-এ ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

মুজিবুর রহমান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পিতা মোহতরম মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ছিলেন মুরব্বী সিলসিলাহ্। শৈশবে তার মা এবং অন্যান্য সন্তানদের সাথে তিনি তাকে কাদিয়ানে পাঠিয়ে ছিলেন (অর্থাৎ মুজিবুর রহমান সাহেবের মা এবং সন্তানদেরকে তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ থেকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন)। তার পিতা ছিলেন হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবের প্রাথমিক ছাত্রদের একজন। মওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব এবং গোলাম আহমদ বদ্দুমলহী সাহেব প্রমুখ বুযুর্গগণ তার সহপাঠী ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের পিতা) প্রায় ৩৬ বছর বঙ্গদেশে সেবা করেছেন। পেশাগত দিক দিয়ে মুজিবুর রহমান সাহেব উকিল ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক সফল উকিল ছিলেন। জামা'তী সেবাও তিনি অনেক করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে ১৯৮০ সালে আহমদীয়া জামা'ত রাওয়ালপিণ্ডির আমীর নিযুক্ত করেন এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে রাওয়ালপিণ্ডির মারি রোডের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় তিনি অনেক সেবা করেছেন। ১৯৭৮ সালে উচ্চ আদালতে ডেরা গাজি খান এর মসজিদের মামলায় তিনি লড়েন। অগণিত জামা'তী মামলা রয়েছে, যেগুলো তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে লড়েছেন। ১৯৭৮ সালে মজলিসে শূরার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হন। এরপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়ম নীতি সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখেন। ফিকাহ্ কমিটির সদস্য হিসেবে ফিকাহ্ আহমদীয়ার প্রথম খণ্ড সম্পাদনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এরপর ১৯৭৭-৭৮ সালে সালানা জলসায় তিনি **'ইসলাম এবং ধর্মীয়-স্বাধীনতা'** বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৯ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত সালানা জলসায় **'ইসলামে মতবিরোধের সূচনা', 'আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আহমদী', 'নিরাপত্তার দুর্গ', 'আহমদীয়াত রূপী বৃক্ষের-সুমিষ্ট ফল'** ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এমটিএ-র বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভে বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ধর্মীয় জ্ঞানেও সমৃদ্ধ ছিলেন আর জাগতিক জ্ঞানেও জ্ঞানী এবং সুবক্তা ছিলেন আর এদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা থেকে তিনি পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে জামা'তের সেবার সুযোগ দান করেন। এমটিএ-র প্রোগ্রাম সমূহের মাঝে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয়-পরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর আলোকপাত, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সাক্ষাৎকার, বারাহীনে আহমদীয়ার সৌন্দর্য, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৪ সালে আহমদীয়া বিরোধী অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে শরীয়া আদালতে দায়েরকৃত মামলায় লড়াই করার সৌভাগ্য তার হয়েছে এবং সেখানেও তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেন। ফৌজদারী আদালতেও জামা'তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহ লড়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। খোদার পথে যারা বন্দি হয়েছেন, তাদের সেবা করারও তিনি সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯৩ সালে সর্বোচ্চ আদালতে মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য যে কমিটি ছিল, তিনি তারও সদস্য হন এবং সেখানেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জুরি কাউন্সিলে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ লাভ করেন। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ইত্যাদি দেশে মানবাধিকার বিষয়ে বুদ্ধিজীবি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করার এবং সেমিনারে যোগ দেয়ার সুযোগও তিনি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে মিনেসোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের সুযোগ পান এবং জার্মানীর একটি আদালতে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত একজন অভিজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে নিজ সাক্ষ্য রেকর্ড করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি **'ধর্ম এবং বিবেকের স্বাধীনতা'** বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭ সালে কুরআন কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, যাতে আহমদীয়া জামা'তকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় আর সেখানেও তিনি জামা'তের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যকে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুইজারল্যাণ্ড এবং কানাডায় ইমিগ্রেশন বোর্ডের সামনে আইনগত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেন। এছাড়াও তার আরো বহু সেবা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তার ওপর অর্পিত সমস্ত জামা'তী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন এবং পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে তা করেন।

তার বিয়ে হয়েছিল আপন চাচাতো বোনের সাথে। তার স্ত্রী ১৯৯৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন। এখন তার তিন পুত্র রয়েছে। আজিজুর রহমান ওয়াকাশ সাহেব রাওয়ালপিণ্ডিতে উকিল। তিনিও জামা'তের মামলা সমূহে সাহায্য করেন। ডাক্তার আতাউর রহমান মায সাহেব আজকাল কাতারে আছেন। খলীলুর রহমান হাম্মাদ সাহেব, তিনি পাকিস্তানেই থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৪)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংগে ধর্মীয় বিষয়ে মত-পার্থক্য: কি এবং কেন ?

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়-কাল সম্পর্কিত মত–পার্থক্য:

আখেরী যুগের লক্ষণ ও চিহ্নাবলী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতা:

ইসলামের পূর্ণ-প্রচারকারী রূপে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে নির্ধারিত আগমন-কালের তাৎপর্য:

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টান্ত:

উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা অংশটি কুরআন মজীদের তফসিরে সগীর-এর আলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

(১) দুইটি সমুদ্র একত্রিকরণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (সূরা আর রাহমান : ২০-২১)

"তিনি দুটি সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়ে উভয়কে একীভূত করবেন। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক রয়েছে যা ইহারা অতিক্রম করতে পারছে না।" (৫৫ : ২০-২১)।

[নোট: সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৪ আয়াতেও দুটি সাগরকে মিলিয়ে দেয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে]।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: 'দুটি সমুদ্র' মানে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর হতে পারে কিংবা উভয় জোড়াই বুঝাতে পারে। এই আয়াতে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে আর পানামা খাল সংযুক্ত করেছে প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখতে বিশ্বের মানুষকে তেরশ' বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই 'দুই সমুদ্র দ্বারা' অন্য অর্থও বুঝাতে পারে, যেমন প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ও ঐশী-বাণী। শেষোক্ত দুটি নিয়মকে ভুলবশত পরস্পর বিপরীত মনে করা হয়, যদিও আসলে এই দুটি পরস্পরের সমর্থক। প্রাকৃতিক নিয়ম হলো আল্লাহর কাজ এবং ঐশীবাণী (ওহী-ইলহাম) হলো আল্লাহর কথা। তাঁর কথা ও কাজে কোনরূপ গরমিল থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য যে মিশরে অবস্থিত সুয়েজ খালের খনন কাজ ১৮৫৯-১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয় এবং খালটির মোট দৈর্ঘ্য ১৯৩ কি. মি। দ্বিতীয়তঃ পানামা–খালের খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৯০৪-১৯১৪ সন পর্যন্ত সময়–কালে যা আগমনকারী দাবীকারকের যুগেরই সত্যায়নকারী।

(২) আধুনিক কালের মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

(সূরা আর রাহমান ঃ ৩৪)

"হে জিন ও ইনসানের দল! তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না।" (৫৫ ঃ ৩৪)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই আয়াতটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা যারা বস্তু-বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করেছে বলে গর্ব বোধ করে তাদেরকে এই আয়তে বলা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যেসব প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্ব-জগতের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেই সব আইন–কানুন তারা কখনো সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করতে পারবে না। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন সর্বাধিক ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ছাড়া তারা সফলকাম হবে না। এর অর্থ এও হতে পারে যে 'তোমরা আকাশ ভেদ করে যেখানেই যাও না কেন তোমরা

দেখতে পাবে, সেখানেও আল্লাহ্‌র শাসন ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। এই আয়াতে বর্তমান যামানার রকেট, স্পুটনিক ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খেয়াযানগুলোর প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা দিয়ে শিল্প উন্নত দেশ বিশেষতঃ আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছে। তাদেরকে বলা হয়েছে বড়জোর তারা মাত্র কতগুলো গ্রহ–উপগ্রহে যেতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশ্ব-মহাবিশ্ব তো অসীম ও ধারণাতীত।

(৩) মানুষ রকেটের সাহায্যে গ্রহ–উপগ্রহে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে --- পৃথিবীর গুপ্ত ধন–সম্পদ বিপুল পরিমাণে নির্গত হবে। (সূরা আল ইনশিকাক ঃ ৪–৫)।

"আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে। এবং যা-ই এতে রয়েছে তা সে বের করে দিবে ও খালি হয়ে যাবে।" (৮৪ ঃ ৪-৫)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রথমোক্ত আয়াতটির একটি অর্থ হলো এই যে, কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলোকে কেবল আকাশের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হতো সেগুলো পৃথিবীরই অংশ বলে পরিচিত হবে এবং মানুষ রকেটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছুবারও চেষ্টা চালাবে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে এমন এক যুগ আসবে যখন পৃথিবী তার গুপ্ত ধন-সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বের করে দিবে যাতে মনে হবে যে এ যেন নিজেকে খালি করে দিচ্ছে। এই সকল ঘটনা আখেরী যুগের সত্যায়নকারী।

(৪) আধুনিক যুগের দ্রুতগতি-সম্পন্ন যান-বাহন আবিস্কৃত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী (সূরা আত তাকভীর ঃ ৫)।

"এবং দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে যখন অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে" (৮১ঃ৪)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: শেষ যুগে আরবের মত মরু দেশেও উটনীর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, যান–বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যান-বাহন, যেমন মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি এর স্থান দখল করে নিবে। হযরত রসূল করীম মোহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীসে উটের যায়গায় অন্য যান–বাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে: 'উট পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে না' (মুসলিম)। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান যুগেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(৫) নদী ও সাগর সংযুক্ত-করণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

---বিশ্বব্যাপী পুস্তকাদি প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যাপক বিস্তৃতি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (সূরা আত তাকভীর ঃ ৭-৮ এবং ১১)।

"এবং নদী ও সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করে দেয়া হবে"। "এবং (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্র করে দেয়া হবে।" "এবং পুস্তকপুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে।" "এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে"। (৮১ ঃ ৭-৮, ১১-১২)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রথমোক্ত আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে যখন সেচ কার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী বা সমুদ্র থেকে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হবে অথবা খাল কেটে বিশাল নদী ও সমুদ্রগুলোকে সংযুক্ত করা হবে। এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ 'সুজ্জিরা' শব্দটির মধ্যে এ সব অর্থই রয়েছে (মুফরাদাত মুনজিত লেইন)।

দ্বিতীয় আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ করেছে যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত হবে যে অতি দূর–দূরান্তরের ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এ সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মত একত্র হবে। এ আয়াতের অন্য তাৎপর্য হলো এই যে, সমমনা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোকেরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করবে।

তৃতীয় আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, বেতার কেন্দ্র, টিভি, ও সামাজিক মাধ্যম, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এই সকল আবিস্কার এবং ঘটনাবলী শেষ যুগের এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র যা সত্য–সন্ধানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি?

চতুর্থ আয়াতে শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান যে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দীতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়।

(৬) প্রচন্ড আলোড়ন এবং উত্থান-পতন, ভূ-গর্ভস্থ খনিজ-সামগ্রী আবিস্কার এবং গোপন তথ্যাবলী প্রকাশ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (সূরা আয যিলযাল)।

"পৃথিবীকে যখন এর প্রচন্ড কম্পনে প্রকল্পিত করা হবে"। "এবং পৃথিবী এর বোঝা বের করে দিবে"। "তখন মানুষ বলবে, 'এর হলো কী'। "সেদিন এ (পৃথিবী) নিজের সব গোপন সংবাদ বলে দিবে।" (৯৯ ঃ ২-৫)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে এরূপ অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

● ভূগর্ভ উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী নিজ গর্ভস্থ খনিজ সামগ্রী ও ধন-দৌলত বের করে দিবে। সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করে ভূ-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করবে।

● অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নব নব আবিস্কার মানুষকে এমনভাবে তাক লাগিয়ে দিবে যে সে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে, পৃথিবীর হলো কী?

● নবী করীম মোহাম্মদ (সা.)-কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'গোপন কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে' (তিরমিযী)। সামাজিক মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

● পৃথিবী তার ধন-সম্পদ বের করে দিবে। কেননা প্রভূ-প্রতিপালক তাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। 'আওহা' অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

● শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন, কোম্পানী, সমিতি ইত্যাদি গঠন করবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শভিত্তিক দল ও দেশগুলো জোটভুক্ত হয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করবে। বর্তমান যুগের ঘটনাবলী এবং সামাজিক দৃশ্যপট এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে।

(৭) আখেরী যুগের চিহ্ন-স্বরূপ প্লেগ এবং প্লেগরূপ অন্যান্য মহামারীর প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (সূরা আন নমল: ৮৩)।

"আর তাদের বিরুদ্ধে যখন (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে যাবে তখন আমরা তাদের জন্য মাটি থেকে এক প্রকার জীব বের করে আনবো, যা তাদের জখম করবে। কারণ মানুষ আমাদের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করেনি।" (২৭ ঃ ৮৩)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এটি শেষ যমানায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা নির্ধারিত যুগে সংঘটিত হয়েছে। এইরূপ ব্যাখ্যা নবী করীম মুহাম্মদ (সা.) নিজেই করেছিলেন। কিন্তু যদি 'দাব্বাহ্' শব্দ 'স্থুলভাবে জড়বাদী' লোক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশের জন্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ (৩৪ ঃ ১৫) তাহলে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জাতিসমূহের প্রতি আয়াতটি নির্দেশ করে বলে ধারণা করা যায়।

"সিয়াহ্ সিত্তাহ" সুনানে ইবনে মাজার হাদীসেও রসূলে পাক মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ হতে এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে যে, যখনই কোন জাতির মধ্যে বেহায়াপনা প্রসার লাভ করবে– এমন কি লোকেরা প্রকাশ্যভাবে নিলর্জ্জ ও বেহায়াপনা কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন ঐ জাতির মধ্যে আল্লাহ্ গযব তথা শাস্তিস্বরূপ প্লেগ সৃষ্টি করবেন এবং এমন আরও বহু বালা-মসিবত তাদের উপরে অবতীর্ণ করতে থাকবেন যার দৃষ্টান্ত পূর্বযুগের জাতিসমূহে খুঁজে পাওয়া যাবে না। –(সুনানে ইবনে মাজা কেতাবুল ফিতন্, বাবুল অকুবাত)

উল্লেখ্য যে, ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ ইং সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইলহাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে প্লেগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জানতে পারেন এবং দেশবাসীকে সতর্ক করেন। ('সিরাজুম মুনীর' পুস্তক এবং ইশতেহার ৬/২/১৯৯৮ইং)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত প্লেগের নিদর্শন সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো:

● আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা বিশেষভাবে প্লেগ থেকে রক্ষা পাবে

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) লিখেছেন:

আল্লাহতা'লা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, কাদিয়ানে মারাত্মক আকারে কোন "তাউন" (প্লেগ) প্রকাশ পাবে না। অতঃপর 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকে তিনি একটি ইলহাম প্রকাশ করলেন– "ইন্নি উহাফেজু কুল্লা মান ফিদ্দার" অর্থাৎ "তোমার এই বাড়ীর প্রাচীরের ভিতর যারা অবস্থান করবে তাদেরকে আমি বিশেষভাবে রক্ষা করব।' অর্থাৎ আমার বসতবাড়ীর চার দেওয়ালের ভিতরে যারা অবস্থান করবেন এবং মুত্তাকী ও সালেহ হবেন তারাও এই রোগ হতে নিস্কৃতি লাভ করবেন। –(কিশতিয়ে নূহ, ১৯০২ইং)।

● 'এইডস' (AIDS) বর্তমান যুগের এক প্রকার প্লেগ-তুল্য মারাত্মক রোগ

হযরত আহমদ (আ.) ১৯০৭ সনে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তাউন বা প্লেগ রোগটির প্রকোপ কেবল যে শুধু ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং এই মারাত্মক রোগটি অন্যান্য স্থানেও প্রসার লাভ করবে। তিনি ইলহামের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন: "ইউরোপ ও খৃষ্টান দেশসমুহে এরূপ এক প্রকারের প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ করবে যা বড়ই মারাত্মক আকার ধারণ করবে।" (তাযকেরা, ৭০৫)।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষত: ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ে অবস্থিত বিভিন্ন দেশে 'অওউল্ল (এইডস) রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বহু পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমান যুগের এই রোগটিকে এই শতাব্দীর নতুন "তাউন" বা "প্লেগ" বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই মারাত্মক রোগটি বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

● আহমদীয়া সংগঠনে বয়আত গ্রহণের দৃষ্টান্ত

তৎকালীন ভারতবর্ষে বিশেষভাবে পাঞ্জাবে ১৮৯৮-১৯০৬ইং পর্যন্ত প্লেগের মহামারীতে একদিকে যেমন অনেক

বিরুদ্ধবাদীসহ বহু লোকের প্রাণহানী ঘটেছে, অন্য দিকে আহমদীয়া জামাতে বয়আত গ্রহণ-কারীর সংখ্যাও চার লক্ষাধিক সীমায় পৌঁছে যায়। ঐশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিমগণ ঐ মহামারী থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা লাভ করে।

● একজন প্রসিদ্ধ আলেমের উদ্ধৃতি:

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী আর-বুরসুয়ী (মৃত্যু ১১৩৭ হিজরী) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের (২৭ ঃ ৮৩) ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে ইমাম মাহদীর যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং 'দাব্বাহ' (এক প্রকার কীট, বের হবে এবং পরে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। 'রূহুল বায়ান')।

● হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগেও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি স্বরূপ ৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল এবং পরে ১৬৭ খৃষ্টাব্দে এশিয়া মাইনর থেকে রোম এবং মিশর পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্লেগের আক্রমণে বহু প্রাণহানী ঘটেছিল। বস্তুতঃপক্ষে পৃথিবীতে ঐশী সতর্ককারী হিসেবে আগমনকারী দুই মসীহ-এর মধ্যে অনেকগুলো সদৃশ ঘটনাবলীর মধ্যে প্লেগের নিদর্শন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে) প্রণীত জবাবষধঃরড়হ, জধঃরড়হধষরঃু, কহড়ষিবফমব ধহফ এঃৎঃম্ব নামক পুস্তক পৃঃ ৬৩৩-৬৫২)।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে সত্য সন্ধানীদের জন্য প্লেগের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন:

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় কালে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভারতবর্ষে পাঞ্জাব অঞ্চলে ১৮৯৭খ্রি. হতে ১৯০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী মহামারী রূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতার সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো. প্লেগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই তিনি আল্লাহতা'লার কাছ থেকে জানতে পেরে দেশ-বাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জামাতের সদস্যদের প্লেগ থেকে সুরক্ষা ও হেফাজতের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুতির সু-সংবাদ দিয়েছিলেন যা সেই সময় কালের বাস্তব ঘটনার দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে। এই সকল ঘটনা কি দাবীকারকের সত্যতার বাস্তব প্রমাণ নয় ? তৃতীয়তঃ বণী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে তাঁর যুগে (৬৫ এবং ১৬৭ খ্রি .) যেভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছিল তেমনিভাবে আখেরী যুগে ঈসার সদৃশ মোহাম্মদী মসীহ-এর যুগে তাঁর দাবীর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন এবং দাবীর সময়কাল সম্পর্কিত বিষয়টি সকল বুদ্ধিমান এবং সত্য-সন্ধানী ব্যক্তির জন্য চক্ষু-উম্মীলনকারী সাক্ষ্য–প্রমাণ নয় কি? ফলতঃ সত্য ও মিথ্যার মধ্যস্থিত পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং সপ্রমাণিত নয় কি?

(৮) বনী ইস্রায়েলী (ইহুদী) জাতির পুন: একত্রিকরণের সময় কাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা:

আল্লাহতা'লা পবিত্র কারআনে সূরা বণী–ইস্রায়েলে বলেছেন ঃ "তাহার (মুসার) পর আমরা ইস্রায়েল জাতিকে বলিয়াছিলাম, তোমরা যমীনে (কেনানে) বসবাস কর, অতঃপর পরবর্তীকালে যখন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে (ওয়াদুল আখেরা), তখন আমরা তোমাদিগকে (বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে) আনয়ন পূর্বক পুনরায় একত্রিত করিব।" (১৭ ঃ ১০৫ আয়াত)

প্রায় দুই হাজার বছর পর ইহুদী–জাতির পুনঃ একত্রীকরণের প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের যুগ–সন্ধিক্ষণে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে ঐ যুগ সম্পর্কে সন্দেহাতীতরূপে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক 'বালফোর ঘোষণা' (১৯১৬ খৃঃ) অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কুটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদীদের পৃথক আবাসভূমির পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যা ১৯৪৯ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র হিসেবে বাস্তব রূপ লাভ করে। এইভাবে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইহুদীদের পুনরায় একত্রিকরণের ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। শেষ–যুগের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত আয়াতে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

আখেরী যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন ঃ "একটি নিদর্শনই যথেষ্ট যদি হৃদয়ে খোদা–ভীতি থাকে।"

[চলবে]

Smile Aid
your complete dental healthcare
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital–DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy–Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

পিছন ফিরে দেখা-

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন

(অ-আহমদী বুযুর্গ ও পত্রিকার উদ্ধৃতিমূলে)

অধ্যাপক আলহাজ্জ ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম

[এ প্রবন্ধ এক যুগেরও আগে(২০০৭) প্রকাশিত; তবে গুরুত্বের মানে বিষয়টি কালোত্তীর্ণ।]

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের কথা বললে অনেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন,

১। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময় এখনও হয়নি।

২। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হয়ে গেছে বা তাঁর আগমনের সময় হয়েছে এমন কথা শুধু আহ্‌মদীয়া জামা'তই বলে থাকে।

এই অভিমত দু'টির আলোচনা করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

আমার এই প্রবন্ধে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে কয়েকটি মূল বিষয় আলোচনা করেছি। এগুলো হলো.

১) ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে আসবেন, এটা কি নিশ্চিত?

২) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হলে তাঁকে কি মান্য করতে হবে?

৩) ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কখন আসবেন?

৪) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের কয়েকটি লক্ষণ।

৫) ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এসে গেছেন: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তবিদদের ঘোষণা।

৬) ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কোন এলাকায় আসবেন।

৭) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নাম কি হবে?

৮) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার জন্য উদাত্ত আহ্বান।

৯) চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হওয়ার দাবীদার।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করার সময় আমরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য নন এমন বিজ্ঞ আলেমগণের এবং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের বাইরে থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইসলামী প্রকাশনার উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্দেশ্য এটি প্রদর্শন করা যে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের বিষয়টি শুধু আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত নয়, এই জামাতের বাইরের বিজ্ঞ আলেমগণও ব্যাপকভাবে আলোচনা করছেন।

প্রবন্ধে অন্যান্য আলেমগণের উদ্ধৃতিগুলোর ভাষা সব স্থানে সঠিক মনে না হলেও আমরা এর পরিবর্তন করিনি। যেখানে আমরা আমাদের ব্যাখ্যা দিয়েছি তা বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধের শেষে আমরা আমাদের অভিমত দিয়েছি। তবে এর যথার্থতা বিচার করার ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

১। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে আসবেন এটা কি নিশ্চিত?

১.১ উম্মত জননী হযরত ফাতেমা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.)-কে তিনি এরূপ বলতে শুনেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। (হাদীসে রসূল (সা.), মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ০৪)

২। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হলে তাকে কি মান্য করতে হবে?

২.১ ইবনে মাজায় বলা হয়েছে, অতঃপর ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হবেন। তোমরা যে কোন মূল্যে তাঁর হাতে বয়আত করার চেষ্টা করবে। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ০৪)

২.২ যখন তোমরা তাকে দেখতে পাবে তার কাছে বয়আত করিও, যদিও বরফের দেশে থাক এবং তোমাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়। কেননা নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার খলীফা মাহ্‌দী হবেন (মাসিক মদীনা, জানুয়রী ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৯)।

২.৩ তিনি পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র) খলীফা, তাঁর কাছে বয়'আত করিও (হাজা খালীফাতী ফিল আরদ্ব ফাবাইউহু)। (মাসিক মদীনা, জুলাই ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫)

৩। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কখন আসবেন?

৩.১ আবি কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ সেই ২০০ বছর পর দেখা দিবে যা হাজার বছর পর আসবে। (মিশকাত, কিতাবুল ফিতান)

৩.২ উপরে ২.১-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং সমর্থনে হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেছেনঃ সেই দুইশত বছর পরে, যা হাজার বছর পরে আসবে, সেটাই

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর যাহির হওয়ার সময়"। (মিরকাত, শরহে মিশকাত)

৩.৩ পীর আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (রা.) বলেছেনঃ সহস্র হিজরী সনের পরবর্তীকালে তিনশত বছর অতিক্রান্ত হবার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, সে সময় হযরত ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব হবার সময় উপস্থিত হবে। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩) {উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ হিজরী শতব্দীতে হবে।}

৪। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের কয়েকটি লক্ষণ

৪.১ সৌরজাগতিক লক্ষণ: মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) 'মাকতুবাত শরীফ' এর দ্বিতীয় খন্ডে ৬৭ মাকতুবে লিখেছেন, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের জামানায় রমজান মাসের ১৪ তারিখ সূর্যগ্রহণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসেবের বিপরীত এবং কালের নিয়মের বিপরীতে উক্ত রমজান মাসের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হবে। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫)

শায়খ আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) 'ফতুহাতে মক্কীয়া' কিতাবে লিখেছেন (কানযুল উম্মাল গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে): ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে একই রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

হযরত রসূলে আকরাম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যে বছর রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয়ই (এক মাসে) সংঘটিত হবে, ঠিক সেই বছরই হজ্জের মৌসুমে ইমাম মাহ্‌দী আত্মপ্রকাশ করবেন। (ডঃ মো. সিরাজুল ইসলাম, মুসলিম পুনর্জাগরণ: প্রসঙ্গ ইমাম মাহ্‌দী, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃঃ ৬৯)

{চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে যে হাদীসটি রয়েছে তাতে এই গ্রহণসমূহ প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে হবে এবং ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হবে এমন কোন কথা নেই। মূল হাদীসটি হ'ল, "ইন্না লি মাহ্‌দীনা আয়াতায়নে, লাম তাকূনা মুন্‌যু খালকিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরয্‌; ইয়ানকাসিফুল কামারু লি আওওয়ালি লাইলাতিম মির রামাযানা, ওয়া তানখাসিফুশ্‌ শামসু ফিন্নিসফি মিনহু" অর্থাৎ- নিশ্চয় আমাদের মাহ্‌দীর জন্য এমন দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি (কারো সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ) প্রকাশিত হয়নি। (তা এই,) চন্দ্রগ্রহণ হবে (চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর) প্রথম রাতে ও সূর্যগ্রহণ হবে এর (অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের দিনগুলোর) মধ্যম দিনে।}

৪.২ ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব কালে আরব অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবকালীন সময়ে আরব ভূমি হবে উর্বর এবং সরস। কৃত্রিম খালের পানির প্রবাহ নিশ্চিত করে ধূসর মরুভূমি সুজলা সুফলা হবে। বাগবাগিচায় ভরে যাবে। শস্যের প্রচুর উৎপাদন হবে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ আবিষ্কারের ফলে আরববাসীরা সম্পদশালী হবে। সেসময় সম্পদের এতই প্রাচুর্য হবে যে, কেউ যাকাত গ্রহণ করবে না। (মুসলিম মেশকাত শরীফ; মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৪)

৫। ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছেনঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের ঘোষণা

মাসিক মদীনার বিজ্ঞ লেখক বেশ কয়েকজন ইসলামী বিশিষ্ট চিন্তাবিদের কথা বলেছেন যারা ঘোষণা করেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেছে বা তাঁর আগমন অতি নিকটে। এই ঘোষণাগুলো নিম্নরূপঃ

৫.১ ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর মাওলানা মোহাম্মদ মঈজ উদ্দিন হামিদী সাহেব, খুলনা-এর ঘোষণা: অভিন্ন পাকিস্তান থাকাকালীন ১৯৭০ সনে তৎকালীন রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অধীনে বালিয়া ডাঙ্গা গ্রামে এক বৃহৎ ধর্মীয় জলসায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ধর্মানুরাগীদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন ইমাম মাহ্‌দীর জন্ম হয়ে গেছে। পীর সাহেব ইমাম মাহ্‌দীর জন্ম কোথায় বা কখন হয়েছে তা বিস্তারিত কিছুই বলেননি। সে মজলিসে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) লোক উপস্থিত ছিলেন। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৬)

৫.২ ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরাফুরা শরীফের পীর মোহাম্মদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব, (কোলকাতা, ভারত)-এর ঘোষণা ১৯৮৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ঈশ্বরদীর ইসালে সওয়াব মাঠে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরফুরা শরীফের পীর মোহাম্মদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী হাজার হাজার লোকের উপস্থিতেতে ঘোষণা করেন, ইমাম মাহ্‌দীর জন্ম হয়ে গেছে। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেন নি। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৭)

৫.৩ সৌদী আরব থেকে আগত তাবলীগ জামাতের আমীরের ঘোষণা গত অক্টোবর ২০০৩-এ সৌদী আরব থেকে আগত তাবলীগ জামাতের আমীর বিশেষ আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 'ওসধস গধযধফর রং শহড়পশরহম ধঃ ঃযব ফড়ড়ৎ' (ইমাম মাহ্‌দী দরজায় কড়া নাড়ছেন) মারকাজ মসজিদ কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ এর জামাতে উপস্থিত মুসল্লিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য। (মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৭)

৬। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কোন্‌ এলাকায় আসবেন

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) 'আলামাতে ইয়াওমেল কিয়ামাহ' গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ সেই প্রশংসিত এবং প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী শেষ যামানায় সশরীরে আবির্ভূত হবেন। পূর্বাঞ্চল হতে তিনি প্রকাশিত হবেন। (ডঃ মো. সিরাজুল ইসলাম, মুসলিম পুনর্জাগরণ: প্রসঙ্গ ইমাম মাহ্‌দী, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫ পৃঃ ১৩৯)

৭। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নাম কি হবে

বাগদাদ শরীফের বড় পীর হযরত সৈয়দ

মুহীউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ) আগমন করবেন যা সত্যে পরিণত হয়েছে। আবার হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে 'আহমদ' নামে একজন বিশ্ব নেতা বা সংস্কারকের আবির্ভাব হবে। হিজরী ১৫০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (২০০২ ইংরেজী সনের পরে) উক্ত ৪০০ বছর শেষ হবে। অতএব আশা করা যায়, হিজরী ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে (অর্থাৎ ২০০২ সালের মধ্যে) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব অনিবার্য। (হযরত শাহ সূফী এম, এন, আলম, ২০০২ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বশান্তির পয়গাম নিয়ে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন, ওরিয়েন্টাল বুক সার্ভিস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৫১)

৮। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার জন্য উদাত্ত আহবান

একজন বিশিষ্ট লেখক লিখেছেন, "ইসলামী চিন্তাবিদদের ঘোষণা অনুসারে ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের সময় খুবই নিকটবর্তী। এটা সত্য হলে আমাদের অবশ্যই মানসিকভাবে ইমাম মাহ্‌দীকে সাহায্যের জন্য (বা আন্তরিকভাবে গ্রহণের জন্য) প্রস্তুত থাকতে হবে। হাদীস অনুসারে তাঁকে এবং তাঁর সাহায্যে আসা সেনাবাহিনীকে সকলের সাহায্য করা ওয়াজেব। ইমাম মাহ্‌দীর যখনই আবির্ভাব হোক না কেনো সত্য ভক্তদের অবশ্যই ইমাম মাহ্‌দীকে স্বাগত জানানোর জন্য সদা সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। শেষ যামানায় ইসলামকে রক্ষার জন্য এটাই হবে সর্বশেষ এবং একমাত্র উপায়"। (মুসলিম পুনর্জাগরণ: প্রসঙ্গ ইমাম মাহ্‌দী, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃঃ ১০৪)

৯। চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হওয়ার দাবীদার

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীতে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ চতুর্দশ হিজরী শতাব্দী) থেকে ইমাম মাহ্‌দী হিসাবে বয়'আত গ্রহণ শুরু করেন। তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছে (১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্দ্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্দ্ধে)। তাঁর জন্ম পূর্বাঞ্চলে হয়েছে। তাঁর নাম 'আহমদ'। উপরে বর্ণিত হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমতের সঙ্গে এই বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে পরিচিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বর্তমানে পৃথিবীর ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৮৩টি দেশেই রয়েছে। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

উপসংহার

বুযুর্গানে দীনের অভিমত অনুসারে ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হওয়ার কথা। যেহেতু এখন চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়ে পঞ্চদশ হিজরীরও ছাব্বিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে সেহেতু সবার কাছে একটি বড় প্রশ্ন, ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হওয়ার দাবীদার কে এবং তাঁর সত্যতা কিভাবে যাচাই করা যায়?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) অবশ্যই আসবেন, তিনি এলে তাঁকে মানতে হবে, তিনি ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে আসবেন, তিনি পূর্বাঞ্চলে আসবেন এবং তাঁর নাম 'আহমদ' হবে। আরব ভূমিতে পানি সেচের মাধ্যমে চাষ হবে এবং খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের ফলে আরববাসীদের আর্থিক অবস্থার অসাধারণ উন্নতি হবে।

যেহেতু এখন ১৪২৮ হিজরী সন চলছে, অর্থাৎ এটা পঞ্চদশ হিজরী, সেহেতু চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে মান্য করা উচিত। নতুবা যারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবী মানতে অস্বীকার করেন তাদের কাছে আমাদের আহ্বান তারা যেন ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রত্যাশিত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে উপস্থিত করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন, ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

এ আমার বিনীত অঙ্গীকার

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

[হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) জামা'তের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মুরব্বী-মুবাল্লেগ-মোয়াল্লেম এবং ওয়াকেফীনে নও সহ সকল পর্যায়ের পদাধিকারীদের উচ্চতর নৈতিক উৎকর্ষতাপূর্ণ দায়িত্বশীল আচরণ করার প্রতি বিভিন্ন খুতবায় বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উচ্চতর নৈতিক মান নির্দেশিত করে তা অর্জনের বাধ্যবাধকতার গুরুত্ব বিবেচনায় হুযূর(আই.) আমাদের জামা'তের সেবাদানকারীদের ঘন ঘন উপদেশ দিয়ে থাকেন; যাতে এর ঘাটতির কারণে জামা'তের অগ্রগতি ব্যাহত না হয়।

দক্ষতার সাথে জামা'তকে সেবাদান করার ক্ষেত্রে, মূলতঃ সুনির্দিষ্টভাবে যদিও তাদেরকেই সম্বোধন করে হুযূর(আই.) দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর এই আহ্বান প্রত্যেক সেই আহমদী মুসলিমের জন্য; যে এখনও কাঙ্খিত সেই উন্নত নৈতিক আচরণ রপ্ত করে উঠতে পারেনি।

উৎকর্ষতার মানদণ্ডে যে উচ্চতায় হুযূর (আই.) আমাদেরকে দেখতে চান, তার প্রতি সচেতন ও সজাগ প্রচেষ্টা চালানোর বিনীত অঙ্গিকার এই নিবন্ধে তুলে ধরা হচ্ছে।

তাই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে পবিত্র পরিবর্তন আনার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর এমনটিই প্রত্যাশা আর আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশও এটাই। আল্লাহ্ তা'লা সেইসব মহান প্রত্যাশা পূরণের তৌফিক আমাদের দান করুন, আমীন!]

খেলাফতের সাথে যোগাযোগ

জুমুআর নামায আদায়ে জুমুআর খুতবা শুনাও ফরয:

জুমুআর খুতবাটি জুমুআর নামাযের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ; তাই কেবল বা'জামাত নামায আদায় করতেই নয় বরং খুতবা শুরুর আগেই মসজিদে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত।

এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-র আশীর্বাদ দান করেছেন। ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে জুমুআর নামাযের সময় একই। এই ক্ষেত্রে যুগ-খলীফার খুতবা আমাদেরকে সময়মতই সরাসরি শুনতে হবে।

যে সমস্ত দেশগুলোতে সময় একই নয়, সেখানেও খুতবা এমটিএ-র সম্প্রচারকালে সরাসরি শোনা উচিত বা রেকর্ডিং হিসাবে পরে হলেও দেখা উচিত। মুরব্বী-মুবাল্লেগ-মোয়াল্লেম সাহেবদের উক্ত খুতবার একটি বিবরণ একই দিনে বা পরের শুক্রবার সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া উচিত। জামা'তের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এটি মহান একটি পন্থা। (০১জুলাই ২০১৬)

খেলাফতের পবিত্র সান্নিধ্য মানুষের অনুভূতি আর দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় :

সম্প্রতি, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন বয়সের শত শত খোদ্দাম লণ্ডনে হুযূরের সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে যারা সম্প্রতি বয়আত নিয়েছিল। তারা তিন দিন হুযূরের পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থান করায় তাদের অনুভূতি আর দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এমন আশ্চর্যজনক আন্তরিকতা এবং আনুগত্য তারা প্রকাশ করেছে, যা ছিল অবাক করা। দেশে ফিরে তাদের অনুভূতি তারা প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনও উল্লেখ করেছে। তারা নিয়মিত নামায আদায়ে তৎপর থাকছে, নিয়ম মাফিক জামা'আতের সাথে তারা সংবদ্ধতা বজায় রেখে দিন কাটাচ্ছে, আর খেলাফতের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রাখার এবং সে সম্পর্ক বিকাশের বা বর্ধন করার তাদের যে প্রতিশ্রুতি, তা যথারীতি তারা পালনও করে চলছে। পূর্বে, খেলাফত সম্পর্কে তাদেরকে খুব বেশি কিছু জানানো হয় নাই, আর তাদের তেমন অভিজ্ঞতাও ছিল না। সন্দেহ নেই, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করায় সংযোগ বাড়ে আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিকাশ ঘটে এবং উভয় পক্ষের মাঝে এক নিবিড় ভালবাসা গড়ে ওঠে। তবে আলেম এবং পদাধিকারীরা জামা'তের মধ্যে খেলাফতের তাৎপর্য উল্লেখ করা যদি অব্যাহত রাখেন তবে ঈমান আরও দৃঢ় এবং পরিশীলিত হয়। (২৯ মে ২০১৫)

নবাগত এবং তরুণদের ধার্মিকতার শিক্ষাদানে বুযুর্গগণের উদ্যোগী হওয়া উচিত :

জামা'তের বুযুর্গগণের খেলাফতের সাথে সত্যিকারের সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে নবাগতদের এবং তরুণদের শিক্ষা দান করা উচিত।

এ দুর্বলতার জন্য কতিপয় পদাধিকারীও দায়ী, যাদের ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে। খেলাফতের সাথে সংযোগ স্থাপনের বিকাশ ঘটাতে জামা'তের সদস্যদের

ধার্মিকতার মান উন্নত করা উচিত। কিছু পদাধিকারী ব্যক্তি মনে করেন যে, বছরে একবার খেলাফত দিবস পালন করা যথেষ্ট। এর উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযি.) বলেছিলেন, জামা'আতে খেলাফত বিষয়ক শিক্ষাদানে আগে পর্যাপ্ত জোর দেওয়া হয়নি, এর পর থেকে কিছু চেষ্টা করা হলেও উন্নতির অবকাশ এখনও রয়ে গেছে। সেই উদ্ধৃতি তুলে ধরে হুযূর (আই.) পুণরায় জামা'তের দৃষ্টি নিবদ্ধ করান। (২৯ মে ২০১৫)

হুযূর (আই.) পদাধিকারী ব্যক্তি এবং জামা'আতের অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে খিলাফতের সাথে সংযোগের কারণে তারা জামা'আতের সেবা করতে পেরে ধন্য হয়েছে আর এতে তাদের সক্ষমতাও লাভ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এটি ধারণা করা বা মানুষের কাছে এটি অবিশ্বাস্য যে কোনও ভাল ফলাফল বা সাফল্যের পিছনে শুধুই তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি বা কঠোর পরিশ্রম রয়েছে। ঈমানের ক্ষেত্রে খেলাফত ব্যতীত কারও আশিসলাভ হতেই পারে না - এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। (২৯ মে ২০১৫)

খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা, এ থেকে ভালবাসা আর আনুগত্যে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া যায় :

খেলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্য আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করে এবং ভাল ফলাফল বা সাফল্য বয়ে আনে, কারণ খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবস্থাপনা। পদাধিকারীরা যদি কোনও স্ব-গুরুত্ব বোধ কখনও অনুভব করে থাকেন, তবে তাদের ইস্তেগফার করা উচিত।

আহমদীয়া জামা'তের উন্নতির ক্ষেত্রে আলেমদের জ্ঞানও কার্যকর কোন কিছু করছে না, আর বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিমত্তাও কোন কাজ করছে না, আর জাগতিক জ্ঞানীদের জ্ঞান ও নৈপুণ্যও কোন কাজ করছে না। কোন ধর্মীয় জ্ঞানী, কোন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন ব্যক্তির জ্ঞান এবং দক্ষ ব্যক্তির নৈপুণ্য জামা'তের কোন কাজে যদি অস্বাভাবিক ফলাফল সৃষ্টি করছে, তাহলে তা শুধুমাত্র খোদার অনুগ্রহ এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার কল্যাণেই হচ্ছে। কেননা এই সম্পৃক্ততারই কারণে খোদা তা'লার এসব ফলাফলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তা-ই, তিনি তা দান করছেন।

কর্মকর্তা এবং পদাধিকারীদের কাজে যে আশিস রয়েছে বা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কাজ করার যে সুযোগ দিচ্ছেন, এটি কেবল এবং শুধুমাত্র খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার কল্যাণে। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ এক কানা-কড়ি কাজও করতে পারে না। কেউ যদি কোন কোন কাজের ভাল ফলাফলকে জাগতিক জ্ঞান ও মেধা এবং পরিশ্রমের ফসল মনে করে, তাহলে এটি তার আত্মপ্রসাদ নেওয়ার নামান্তর। খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মের নামে কৃত কাজে বিন্দুমাত্র আশিস বা কল্যাণ থাকতে পারে না।

প্রত্যেক মু'মিন, যে ধর্মের জন্য মর্মবেদনা আর জামা'তের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রাখে, আর যে চায়, খোদার জামা'ত সুনামের সাথে জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, আর ইসলাম পুনরায় সেই সম্মান ফিরে পাক যা মহানবী (সা.)-এর যুগে লাভ হয়েছিল, আর এ কাজের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল উদ্যোগ ও চেষ্টা বৃথা না যাক, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হল, খলীফার সাথে দিবারাত্র সহযোগিতা করে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, যেন চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও জামা'তের সংশোধন হয়ে যায়। এমন লোকদের জন্য আবশ্যক, জামা'তের সংশোধনের জন্য খলীফা কিছু বললে তা হৃদয়ঙ্গম করা এবং জামা'তের সদস্যদের সামনে তা বারংবার পুনরাবৃত্তি করা, যাতে সবচেয়ে স্থূল বুদ্ধির মানুষটিও তা বুঝতে পারে এবং ধর্মের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। (২৯ মে ২০১৫)

খেলাফত সম্পর্কে সঠিক অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি জাগিয়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ কাজ :

খেলাফত সম্পর্কে সঠিক অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি জাগিয়ে তোলাও মুরব্বী-মুবাল্লেগ- মোয়াল্লেম সাহেবদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, এবং অন্য পদাধিকারীদেরও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে, যেখানে লোকেরা বলে যে বর্তমান খলীফা এটি করেছে এবং এটি ভুল, একটি ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে, বা এই সিদ্ধান্তটি এইভাবে না হয়ে সেইভাবে হওয়া উচিত ছিল, ইত্যাদি। যে সমস্ত নেয়ামত খিলাফতে রয়েছে তাদেরকে তা বুঝানোর দায়িত্ব বিশেষভাবে মুরব্বী-মুবাল্লেগ-মোয়াল্লেম সাহেবদের ওপর বর্তায় এবং কোন মানুষের উপর আল্লাহ যখন নিজ ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে চান তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে খেলাফতের আশিস সরিয়ে দেন। খেলাফতের এই অনন্য বৈশিষ্ট সকলে ভালোভাবে জেনে গেলে, অবশ্যই তারা হোঁচট খাওয়া থেকে উদ্ধার পাবে। (২৪ জানুয়ারী ২০১৪)

তরবিয়্যত বিভাগ যদি সদস্যদেরকে খেলাফতের সাথে তাদের যোগাযোগ জোরদার করতে এবং জামা'আতের সমস্ত কর্মসূচি এবং খুতবা এবং কর্মকাণ্ডের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে পরামর্শদান অব্যাহত রাখে, তবে তার সুফল যোগাযোগকালে তাদের মাঝে দৃশ্যমান হবে, আর খেলাফতের আলোকজ্জল প্রভা আরও শক্তিশালীরূপে ছড়াবে, ফলে অনেক তারবিয়্যতি ইস্যু আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। (১৬ আগষ্ট ২০১৩)

MTA,
http://www.ahmadiyyabangla.org/
এবং Alislam.org– ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে যতটা সম্ভব প্রতিটি আহমদীর নিজেকে সংযুক্ত রাখার জন্য কাজ করে যাওয়া উচিত। অবশ্য এ লক্ষ্যে জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গসংগঠনগুলোর সবিশেষ চেষ্টা থাকা জরুরী এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সার্বিক মনোযোগ খেলাফতের প্রতি নিবদ্ধ রাখা ভিন্ন কোনই বিকল্প নেই। (১৬ আগষ্ট ২০১৩)

যুগ-খলিফাকে সব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যথা সইবার অপরিমেয় ধৈর্য ও সাহস দান করা হয়:

খলিফাকে সব ধরণের অভিযোগ করে বিরক্ত না করার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের বিরুদ্ধে হুযূর সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আল্লাহ খলীফাকে যেমন নিযুক্ত করেন, তেমনি তাঁর নিজ অনুগ্রহে খলিফাকে সব ধরণের সমস্যা এবং ব্যথা সহ্য করার জন্য ব্যতিক্রমী ধৈর্য আর সাহসও তিনিই দান করেন।

সুতরাং, সমস্ত পদাধিকারীদের উচিত এমন চিন্তাভাবনা ত্যাগ করা এবং তাকওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্তমুলক বিষয়াদিতে খলীফা হুযূরকে অবহিত রাখা। (০১ জুলাই ২০০৫)

কতিপয় লোকের দাবি হলো, এমন কিছু পদাধিকারী রয়েছে যারা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তি, সুতরাং তারা অন্য কারও নয়; কেবলই খলিফার আনুগত্য করতে বাধ্য। কিন্তু এমনটি করা হলে পুরো নেযামে জামা'তের আনুগত্য করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে 'মান্যতা'-র মর্মমূলে এভাবে কেউ খলিফাকে মান্য করতে পারে না।

তবে, কেউ যদি এমন কিছু পর্যবেক্ষণ করে যা রিপোর্ট করা দরকার, তাদের উচিত এটি করা এবং তারপর সর্বাবস্থায় নিজেকে নেযামে জামা'তের অধীনস্ত করে রাখা। (৩১ ডিসেম্বর ২০০৪)

সাধারণভাবে, তাকওয়ার মান জামা'তে যত বাড়ে পদাধিকারীদের মাঝে ততটাই তা প্রতিফলিত হয়। হুযূর (আই.)-র নির্দেশ হলো, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে উচ্চ নৈতিকতার পদাধিকারী তৈরি করা নিশ্চিত করার জন্য উঁচুমানের আনুগত্য অনুশীলন ও পরিচর্যা অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে। (৩১ ডিসেম্বর ২০০৪)

আল্লাহ্ তা'লা সমীপে বিনীত প্রার্থনা, সংশ্লিষ্ট সবাইকে বর্ণিত এসব পুণ্যকর্ম সাধনে তিনি সক্ষমতা দান করুন, আমীন!

[চলবে]

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

▪ গত ০৬/০৯/২০১৯ তাহেরা বিনতে মরিয়ম, পিতা মৃত- আরিফুর রহমান, ৭৩, মোকরক রোড, নগরখান পুর, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে হৃদয় হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গ্রাম-দক্ষিণ মুগরাকুল, পো: যাত্রামোড়া, তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯৯।

▪ গত ০৬/০৮/২০১৯ হোসনেয়ারা পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ হোসেন মোড়ল, সাং-মরাগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, পিতা-মজিবুর রহমান মোড়ল, মরাগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০০।

▪ গত ০৮/০৬/২০১৯ মোসাম্মৎ মোহসিনা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, গ্রাম+পোষ্ট- রামপর, উপজিলা: কাহারুল জিলা- দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মাসুদ আলম, পিতামৃত- ছেরাজল হক, মুগদা কমিশনার গলি, সবুজবাগ, ঢাকা-এর বিবাহ ২,২০,০০০/- (দুইলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০১

▪ গত ১৬/০৭/২০১৯ আতিযা মাহ্‌মুদ, পিতা- মোহাম্মদ হাসান, টেরি বাজার, কাটা পাহাড় লেইন, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম-এর সাথে জাভেদ আহমদ নয়ন, পিতামৃত: নাছির আহমদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৮০,০০০/- (দুইলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০২।

▪ গত ১৭/০৬/২০১৯ মেশআল জ্যোতি, পিতা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (বুলবুল), কুকুয়া, ৭নং ওয়ার্ড, কুকুয়া, আমতলী, জেলা-বরগুনা-এর সাথে নজরুল ইসলাম পিতা- জয়নাল আবেদীন বড়হাট, নাটেরহাট, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৩।

▪ গত ১৬/০৮/২০১৯ রেবেকা খাতুন, পিতা- জমাত আলী ঢালী, মরাগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে শাহ্‌জাহান মোড়ল, পিতামৃত- আফছার মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামপুর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৪।

▪ গত ২৬/০১/২০১৯ নাফিসা আক্‌তার (সোনালী), মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর আহমদ, গ্রাম- ধামপাড়া, পো: কুড়িমাইল, থানা+জেলা কিশোরগঞ্জ-এর সাথে এ, কে, এম গোলাম মোর্তুজযা, পিতা- এ কে এম গোলাম মোস্তফা, গ্রাম-ধনকুড়া, পো: জামাইল, থানা- হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৫।

▪ গত ১৪/০৬/২০১৯ মৌসুমী আক্‌তার, পিতা- মোহাম্মদ মজিবর রহমান গাজী, গ্রাম- ফুলতলী, পো: ফুলতলী, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে শেখ আব্দুস সালাম, পিতা- শেখ আব্দুল ওয়াদুদ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৬।

▪ গত ০৬/০৭/২০১৯ মেহেরুন্নেছা, পিতা- মোহাম্মদ হারিছ মিয়া, গ্রাম- তেরগাতী, পো:-মুমুরদিয়া-২৩৩০ কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ সুলতান ইসলাম, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর-এর বিবাহ ১,০৮,০০০/- (একলক্ষ আট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬০৭।

দাম্পত্য জীবনের বিবাদ-কলহ নিরসনে হুযূর আকদাস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

হুযূর (আই.) অপর এক স্থানে বলেন, "আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আর এমন ঘটনাবলী শুনে খুবই কষ্ট লাগে, কখনো কখনো মন (একথা ভেবে) অস্থির হয়ে ওঠে যে, আমাদের কিছু লোক কোন্‌পথে অগ্রসর হচ্ছে? স্ত্রীর সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা ভুলে যায় এমনকি অনেকে এতটা নীচে নেমে যায় যে, স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অথবা স্ত্রীর অর্থে কেনা বাড়িতে জোরপূর্বক অংশিদার সেজে বসে এবং তাকে লাগাতার হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। হতবাক হতে হয়, ভালো-ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাও কখনো কখনো এমন আচরণ করে। এমন লোকদের উচিত কিছুটা হলেও আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং নিজেদের সংশোধন করা। অন্যথায় স্পষ্টভাবে জেনে নিন যে, জামাতের ব্যবস্থাপনার কাছে বিষয় এলে, ব্যবস্থাপনা কখনো এমন বাজে লোকদের সমর্থন করে না আর করবেও না।"

তিনি আরো বলেন, "সেসব পুরুষ যারা স্ত্রীদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রাখে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই দায়-দায়িত্ব (অর্থাৎ ভরন-পোষণের দায়িত্ব) তাদের নিজেদের এবং স্ত্রীর অর্থে তাদের কোন অধিকার নেই। স্ত্রী-সন্তানের ব্যয় নির্বাহ করা পুরুষদের নিজেদের দায়িত্ব। তাই অবস্থা যা-ই হোক না কেন দিনমুজরি করে নিজের সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হলেও সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব তাদের। তারা যদি পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বরকতও দিয়ে থাকেন এবং স্বচ্ছলতাও দান করেন।" *(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, কানাডা; আল ফজল পত্রিকা, ১৬ জুলাই ২০০৪)*

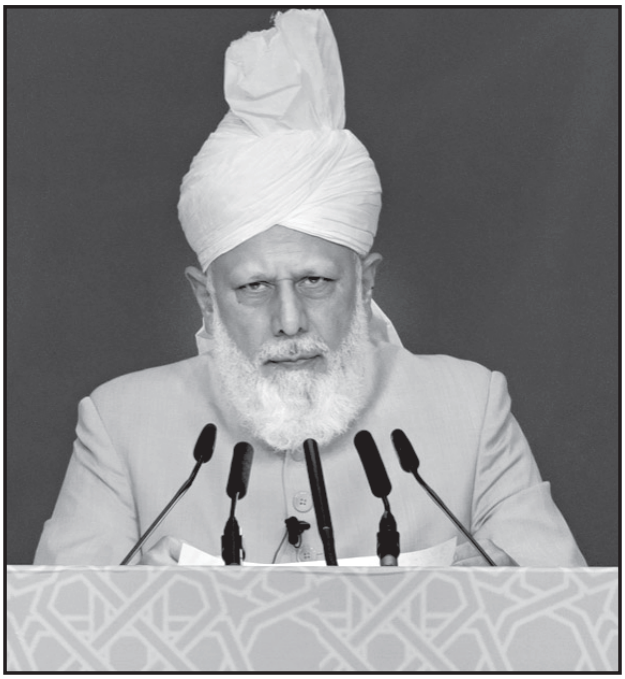

"এখন আমি কিছু সাধারণ বিষয়ে কথা বলছি। যদি বিচ্ছেদ বা তালাক হয়ে যায় তাহলে কতিপয় লোক এখানকার আইনের আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীর অর্থে ক্রয় করা বাড়ির অর্ধেক নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়। আইনের চোখে তারা মালিক হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তারা স্পষ্ট পাপাচার করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি স্ত্রীকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাক তা ফেরত নেবে না–স্ত্রীর সম্পদ হরণ করা তো দূরের কথা।" *(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, লন্ডন; আল ফজল পত্রিকা, ০১ ডিসেম্বর ২০০৬)*

বিবাহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করার সময় তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন,

"গত কিছুদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, আমার বিবাহ হচ্ছে না, পাকিস্তানের রিশতানাতা বিভাগ কোনো সহযোগিতা করছে না। আমি যখন রিপোর্ট সংগ্রহ করলাম তখন জানতে পারলাম, অনেকগুলো প্রস্তাব তারা দিয়েছেন কিন্তু তার পছন্দ হয় নি। এর কারণ হলো, সে বলেছে, বিবাহ হতে হবে আমার নির্ধারিত শর্তানুযায়ী । এই ব্যক্তি নিজে মেট্রিক পাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা সামান্য কিন্তু শর্ত দেয় যে, মেয়ে যেন শিক্ষিত হয় অর্থাৎ মেয়েকে মাস্টার্স পাস, চাকরিজীবি ও উপার্জনশীলা

হতে হবে। বিয়েতে আমাকে বাড়িও দিতে হবে, দশ-বিশ লাখ নগদ টাকাও আমার হস্তগত হওয়া চাই এবং আমার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে অধিকন্তু শুধু ব্যয়ভারই বহন করবে না বরং আমাকে কাজ করার জন্য শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা এবং মেয়ে কিছুই বলতে পারবে না; আমার যখন ইচ্ছে হবে কাজ করবো না হলে করবো না। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে মানসিক রোগী ছাড়া আর কী-ইবা বলা যেতে পারে! এমন প্রস্তাব এবং এমন ছেলেদের প্রতি তো রিশতানাতা বিভাগের ফিরেও তাকানো উচিত ছিল না। (জানি না তারা কেন তার প্রস্তাব পাঠানো অব্যাহত রেখেছে) কেননা, এমন লোকদের সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়ে কোথাও না আবার রিশতানাতা বিভাগের কর্মীরা মানসিক রোগি হয়ে পড়ে।" *(খুতবা জুমুআ, ১লা ডিসেম্বর ২০০৬, লন্ডন)*

অন্যায় দাবি-দাওয়া

উপরোক্ত খুতবাতেই হুযূর (আই.) উভয়পক্ষের অন্যায় দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলেন,

"আক্ষেপ! মানুষ ভালোর সন্ধান করে অথচ নিজে ভাল কাজ করে না। কোন কোন জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি এভাবে দেখা যায় যে, বিয়ের সময় কিছুই বলে না এবং কোন শর্তও আরোপ করে না কিন্তু বিয়ের পর ব্যবহারিক আচরণ এমনই হয়ে যায়, এ মর্মে কারো কারো পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে। মেয়ে পক্ষের কাছে অন্যায় চাহিদা বা দাবি-দাওয়া করতে থাকে, মনোপুত উত্তর না পেলে এবং চাহিদা পূরণ না হলে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি (সৃষ্টি করে) এবং মেয়েরা খোটাঁ-খোঁচা, ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদেরকেও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন এবং করুণা করুন। অতএব, একজন অজ্ঞ এবং দুরাচারী ছাড়া যে নিজের প্রাণের প্রতি অবিচার করেছে, (কেননা মানুষের বিরুদ্ধে যেভাবে অবিচার করা যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কেউ অন্যায় করতে পারে না) অর্থাৎ এমন ব্যক্তি ছাড়া এ ধরনের কথা কে বলে, মূলত যে নিজের প্রাণের প্রতিই অবিচার করে। আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাতের গুণের কোন জ্ঞানই যে রাখে না, যে জানেই না যে আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি কী কী অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে আমল করে সেসব দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি যা আমাদের প্রভু আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তাছাড়া নয়। সূরা শুয়ারার তিন আয়াত সম্বলিত একটি দোয়া আছে যেখানে শিখানো হয়েছে,

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমার সুখ্যাতি সুনিশ্চিৎ করে দাও এবং আমাকে নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

সুতরাং এমন লোক যারা নিজেদের প্রভুকে চিনে না এবং বিবেকবুদ্ধিহীন তাদের কথা-বার্তা শুনে সে দোয়াই করি যা আমাদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন। অতএব, আমাদেরকে সর্বদা আমাদের প্রভুর কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সঠিক বিষয় অবলম্বনের এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করা উচিত। একই সাথে সৎকর্ম করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বারবার নসীহত করেছেন। *(খুতবা জুমুআ, ০১ ডিসেম্বর ২০০৬, লন্ডন)*

২০০৪ সনে ইউ.কে জামা'তের বার্ষিক জলসায় হুযূর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে সূরা নিসার ২০ নম্বর আয়াত পাঠ করেন এবং অনুবাদ করার পর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মহিলাদের সাথে সদাচরণ কর; যাদেরকে তোমরা অন্য পরিবার থেকে বিয়ে করে এনেছ। তাদের আত্মিয়স্বজন, মা-বাবা এবং ভাইবোন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ। তাদেরকে অযথা নির্যাতন করো না, তাদের অধিকার প্রদান কর এবং তাদের প্রাপ্য না দেয়ার অজুহাত খুঁজো না। অপবাদ আরোপের সুযোগ সন্ধান করো না। এই অপচেষ্টায়ও লেগে থেকো না যে, স্ত্রীর সম্পদ থাকলে কীভাবে তা থেকে সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধাও কয়েকভাবে ভোগ করা যায়। একটি হলো বাহ্যিক ধন-সম্পদ, যা দৃশ্যমান। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীকে এতটাই জ্বালাতন বা নির্যাতন করে যে, এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন সময় স্ত্রী এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যার ফলে তার কোন চেতনাই থাকে না আর এই সুযোগে স্ত্রীর সম্পদ থেকে স্বামী সুবিধা ভোগ করতে থাকে। আবার কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না; তখন স্বামী এই চেষ্টায় থাকে যে, স্ত্রী যেন 'খুলা' নিয়ে নেয় আর স্বামীকে যেন তালাকও দিতে না হয় এবং 'মোহরানা'ও পরিশোধ করতে না হয়। এটাও আর্থিক সুবিধা ভোগের একটি পন্থা। এরপর অসহায় বিবাহিত নারীদের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ নির্যাতন চালাতে থাকে, অথচ মোহরানা স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন আচরণ কোনভাবেই বৈধ নয়। আবার কখনো কখনো জোরপূর্বক বা প্রতারণামূলক-ভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি কুক্ষিগত করে। যেমন, স্ত্রীর অর্থ দ্বারা বাড়ি ক্রয় করে এবং কোনভাবে স্ত্রীকে মানিয়ে নেয় যে, এটি আমার নামে দিয়ে দাও বা এর কিছু অংশ আমার নামে লিখে দাও। এভাবে অর্ধেকাংশের মালিক বনে বসে আর মালিকানা স্বত্ত্ব লাভের পর আবার নির্যাতন করা আরম্ভ করে দেয়। আবার এটিও হয় যে, কখনো কখনো পৃথক হয়ে বা তালাক দিয়ে বাড়ির অংশ নিয়ে নেয়। অথবা কেউ কেউ ঘরে বসে থাকে আর স্ত্রীর উপার্জনে চলে। তিনি বলেন, এমন সব পুরুষই অবৈধ কাজ করছে। কখনো কখনো এমনও হয় যে, স্বামী

মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন বা শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং অসহায় স্ত্রী কোন কিছুই পায় না আর তাকে ধাক্কা দিয়ে মা-বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোটকথা এগুলো সবই জঘন্য অন্যায় কাজ, অবৈধ কাজ। ইসলাম আমাদেরকে বলছে যে, স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করো না।

এখন বলুন, এত গভীরে গিয়ে নারীর অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়ার বিষয়টি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম থেকে প্রমাণিত হয় কি? ইসলামই সেই ধর্ম যা নারীর অধিকার প্রদান করিয়েছে।" *(যুক্তরাজ্য জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)*

এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন,
"প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। পুরুষদেরকে 'কাও্ওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয় নির্বাহ করা– এর সবই পুরুষের দায়িত্ব। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এই জামা'তেও কিছু এমন লোক আছে যারা সংসারের খরচ মেটানো বা উপার্জন করা তো দূরের কথা উপরন্তু স্ত্রীর কাছে হাত পাতে আর বলে, আমাদের খরচ নির্বাহ কর; অথচ স্ত্রীর উপার্জনে তার কোন অধিকার নেই। স্ত্রী যদি কোন কোন ব্যয়ভার নির্বাহও করে থাকে তবে তা হলো পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ।" *(জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, লন্ডন; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)*

স্ত্রীর সম্পদ ও সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি

কতক পুরুষের লোভ করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) তাঁর এক খুতবায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন,
"আমাকে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, কানাডায় বিয়ে-শাদির পর খুব স্বল্প সময়ের ভেতর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততার ঘটনা ঘটছে অথবা এজন্যও বিয়ে ভেঙ্গে যায় যে, পাকিস্তান থেকে আগত কোন ছেলে বিদেশে আসার জন্য বিয়েতে সম্মতি দেয় আর এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। এমন লোকদের সামান্য ভয়ও হয় না। এসব ছেলের কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করা উচিত। যাদের সাথে আপনাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ আপনাদের বিদেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনাদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা ছিল না। কোন এজেন্ট বা দালালের মাধ্যমে এলে পনেরো বা বিশ লক্ষ টাকা খরচ হতো। বিনা খরচে এখানে এসে গেছেন কেননা, এখানে আগত অধিকাংশ ছেলে টিকিটের টাকাও মেয়েপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে থাকে; কিন্তু এখানে এসে এ ধরনের চতুরতা প্রদর্শন করে! এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের পছন্দের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নেয় বা কোন কোন সম্বন্ধ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে যায় এবং কেউ কেউ অন্যান্য বাজে কাজে জড়িয়ে যায়; অধিকন্তু এমন ছেলেদের পিতা-মাতারাও তাদের অপকর্মের অংশীদার হয়ে থাকে। তারা এখানে বসবাসকারীই হোন বা পাকিস্তানে বসবাসকারী পিতামাতাই হোন না কেন।

তিনি (আই.) আরো বলেন,
"এ ছাড়া কোন কোন ছেলের চোখ স্ত্রীদের সম্পত্তির ওপর থাকে। সন্তানসন্ততিও হয়ে যায়, কোথায় বাচ্চাদের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করবে! কিন্তু তা না করে আইনের সুযোগ নিয়ে স্ত্রীদের তালাক দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। আর নির্বুদ্ধিতাবশত: স্ত্রী যদি সম্পত্তি দুজনের নামে করে দেয় তাহলে সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করে এবং এরপর স্ত্রী সন্তানদের ছেড়ে চলে যায়।" *(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, কানাডা; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)*

একই প্রসঙ্গে অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন,
"বিবাহিত পুরুষদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে যারা পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিয়ে করে এসব দেশে আসে এবং এখানে এসে কাগজপত্র যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায় তখন স্ত্রীদের সাথে না থাকার বা স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার বিভিন্ন অজুহাত সন্ধান করা আরম্ভ করে দেয়, তার ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে। আল্লাহ্ তালা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণপূর্ণ জীবনযাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করে থাক তাহলে হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ্ তাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। অতএব, বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তাই ভদ্রতার দাবি হলো, একে অপরকে সহ্য করুন, ব্যবহার ভালো করুন, পরস্পরকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করুন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে তোমরা যদি একে অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার কর তাহলে বাহ্যিক অপছন্দ পছন্দে পরিবর্তীত হতে পারে এবং তোমরা এই সম্পর্কের মাধ্যমে অনেক কল্যাণ ও মঙ্গলের ভাগীদার হতে পার। কেননা, তোমরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখ না, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল ও কল্যাণ রেখে দেবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, একবার আমি এক ছেলে সম্পর্কে জানতে পারলাম, তার স্ত্রীর সাথে তার ব্যবহার ভালো নয় বরং খুবই দুর্ব্যবহার করে। তিনি বলেন, একদিন তার সাথে আমার পথিমধ্যে সাক্ষ্যাৎ হয়ে গেল, আমি তাকে এই আয়াতের আলোকে বুঝালাম। সে সেখান থেকে সোজা তার ঘরে গেল এবং

তার স্ত্রীকে বলল, তুমি কি জান আমি তোমার সাথে শত্রুর মত আচরণ করেছি, কিন্তু আজ হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, এখন থেকে আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, এরপর থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে কল্যাণের পর কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং তার ঘরে সুদর্শন চার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় যদি তাঁর নির্দেশ মেনে চল তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এসব কল্যাণ দান করেন।

অতএব, যেসব ছেলে পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে এসে কিছুদিন পর এই বলে নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি বা কোন কোন ছেলে পাকিস্তান থেকে পিতামাতার কথা অনুযায়ী মেয়ে নিয়ে আসে এবং পরে বলে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি, পিতামাতার কথায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছিলাম, তাদের উচিত একটু আত্মবিশ্লেষণ করা। যেমনটি আমি বলেছি, যেসব ছেলের কারণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তারা দুই ধরনের। প্রধানত এখানে বসবাসকারী ছেলেরা, যারা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসে এবং ভাবে যে, কিছুদিন দেখি মন-মতের মিল হয় কি-না। কেননা এখানকার পরিবেশে এই চিন্তাধারাই সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, প্রথমে দেখি দু'জনের মতের মিল হয় কিনা। যদি মিল না হয় তাহলে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দাও। অধিকন্তু এসব লোক যথাসময়ে নিজেদের বিয়ের নিবন্ধনও করায় না পাছে মেয়ের আইনানুগ নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায় আর যেন এখানে থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতারাও সমানভাবে দোষী। যাহোক, এরপর জামা'ত এমন মেয়েদের দেখাশোনারচেষ্টা করে, কিন্তু তাদের এহেন কর্ম এটিই প্রকাশ করে যে, এরা কোনভাবেই জামাতভুক্ত থাকার অধিকার রাখে না ।

দ্বিতীয় ধরনের ছেলে তারা, যারা বহির্বিশ্ব থেকে এসে এখানকার মেয়েদেরকে বিয়ে করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে নিবন্ধনের চেষ্টা করে এবং যখন বিয়ের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তাদের ভিসা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তাদের চোখে মেয়েদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়তে থাকে আর এরপর পৃথক হয়ে নিজেদের পছন্দ অনুসারে আবার বিয়ে করে নেয়। অতএব এই দুই ধরনের লোকই তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আপনারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অবিচার করবেন না, জামা'তকে দুর্নাম করার চেষ্টা করবেন না আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন, তাকওয়ার পথে চলুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন দুরাচারীদের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের ওপরও এক পরাক্রমশালী সত্তা রয়েছেন, যিনি অনেক ক্ষমতাবান।" *(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, লন্ডন; আলফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১লা ০১ ডিসেম্বর ২০০৬)*

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বাণী

"প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তি নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। স্বামীদেরকে 'কাও্ওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয়ভার ইত্যাদি নির্বাহ করা পুরুষের দায়িত্ব।" *(জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, লন্ডন; আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)*

মোহরানার গুরুত্ব: প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং মোহরানা আদায়

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরে এক জুমুআর খুতবায় বলেন, "দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়ে থাকে আর গড়াতে গড়াতে কোন কোন সময় তা ভয়াবহ ঝগড়া-বিবাদে পর্যবসিত হয়। কলহ-বিবাদের পর যদি মীমাংসার কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন উভয়পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয় আর যখন মীমাংসাকারী প্রতিষ্ঠান উভয়পক্ষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেন তখন সেখানে মীমাংসা হয়ে যায়। উভয়পক্ষ অঙ্গীকার করে যে, সবকিছু ঠিক থাকবে, কখনো কখনো লিখিত চুক্তিও হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সমঝোতা করে অফিস বা আদালত থেকে বাইরে বের হতেই আবার মাথা ফাটা-ফাটি শুরু হয়ে যায়, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য বা সম্মানই থাকে না। বিয়ে ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদীর ক্ষেত্রেও অঙ্গীকার রক্ষা করে না।

পারস্পরিক এই অঙ্গীকার আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তাকওয়ার শর্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে জনসমক্ষে করা হয় কিন্তু কিছু এমন স্বভাবের লোকও আছে যারা এরও পরোয়া করে না। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার দেয় না আর, তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে থাকে। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সংসার-খরচ মেটাতে কৃপনতা করে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করে না। অথচ বিয়ের সময় অত্যন্ত গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে সবার সামনে ঘোষণা দেয় যে, হ্যাঁ! আমি এই মোহরানায় বিয়েতে সম্মত আছি।

এখন জানি না এমন লোকেরা দেখানোর জন্য মোহরানায় সম্মতি প্রকাশ করে নাকি পূর্ব হতেই মনে এই দুরভিসন্ধি থাকে যে, মোহরানা যা-ই নির্ধারণ করা হচ্ছে লিখিয়ে নাও, তা তো আর দিচ্ছি না। এধরনের লোকদের এই হাদীস দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, যারা এমন মনোবৃত্তি বা দুর্ভিসন্ধি নিয়ে মোহরানা ধার্য করে তারা ব্যভিচারী।

আল্লাহ্ কৃপা করুন, শতকরা একভাগের নীচেও যদি আমাদের মাঝে এমন লোক

থেকে থাকে, হাজারে একজনও যদি এমন থেকে থাকে তাহলেও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কেননা, পুরনো আহমদীদের শিক্ষাদীক্ষার মান যদি উন্নত হয় তাহলে নতুন আহমদীদেরও সঠিক তরবিয়তের সম্ভাবনা থাকে। তাই এসব বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। *(জুমুআর খুতবা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ লন্ডন; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ মার্চ ২০০৪)*

অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) মোহরানা আদায়ের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য মোহরানা ধার্য করে কিন্তু অভিসন্ধি থাকে যে পরিশোধ করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার মনমানসিকতা নিয়ে ঋণ করে আমি তাকে চোর গণ্য করি।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১)

এখন চিন্তা করে দেখুন, মোহরানা পরিশোধ করা একজন পুরুষের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়্যতেই যদি ত্রুটি থাকে তাহলে এটি খিয়ানত বা চুরি।"

(জুমুআর খুতবা, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ লন্ডন)

হুযূর (আই.) মোহরানা আদায় করা প্রসঙ্গে আরো বলেন,

"কখনো কখনো অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের আকাঙ্খায়, যা কারো কারো মনে সৃষ্টি হয়, আনায়াশে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। কারো যদি বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে আর বৈধ প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে বিয়ে করবে কিন্তু অসহায় প্রথম স্ত্রীকে দুর্নাম করা উচিত নয়। যদি স্ত্রীকে এড়ানোর জন্য (এমনটি) করে থাকে অর্থাৎ (মনে মনে ভাবে) আমি যদি এ ধরণের কথা বলি তাহলে সে নিজে থেকেই 'খুলা' নিয়ে চলে যাবে(অর্থাৎ মোহরানা যদি পরিশোধ না করে থাকে) আর আমি মোহরানা না দিয়েই পার পেয়ে যাবো! এটিও খুবই হীন বা জঘন্য কাজ। প্রথমত এমন পরিস্থিতিতে খোলা হলে কাযা (বা বিচার বিভাগের) অধিকার রয়েছে মোহরানা পরিশোধের সিদ্ধান্ত দেয়ার। দ্বিতীয়ত: এখানকার আইনানুযায়ীও কোন কোন খরচ বহন করার বিধান রয়েছে।" *(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬ লন্ডন; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১লা ডিসেম্বর ২০০৬)*

মোহরানা-সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর অধিকার

হুযূর আনোয়ার (আই.) ২০১১ সনে জলসা সালানা জার্মানিতে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

"আমরা তো আর মোহরানা নিচ্ছি না! আমরা মোহরানা ছেড়ে দিয়েছি! -এ ধরণের মনমানসিকতা নিয়ে কোন কোন ছেলের কাছ থেকে বড় অঙ্কের মোহরানা লেখানো হয়। যদি মোহরানা গ্রহণ না করা হয় তাও মিথ্যাচার। মোহরানা এজন্যই নির্ধারণ করা হয়, যেন স্ত্রী তা গ্রহণ করে এবং এটি নারীর অধিকার, এটি তার নেয়া উচিত।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী বললেন, আমার স্ত্রী মোহরানা ফেরত দিয়ে দিয়েছে, ক্ষমা করে দিয়েছে। তিনি (আ.) বললেন, তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর হাতে মোহরানার অর্থ দাও, এরপর যদি সে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে মোহরানা মাফ হবে নইলে নয়। বেচারার দুই স্ত্রী ছিল। যাহোক তিনি ঋণ নিয়ে যখন উভয় স্ত্রীর হাতে সমপরিমাণ মোহরানার অর্থ তুলে দেন এবং বললেন যে, এখন ফেরত দাও তোমরা তো পূর্বেই মাফ করে দিয়েছ। তখন তারা বলল, আমরা তো এজন্য মাফ করে দিয়েছিলাম যে, আমাদের ধারণা ছিল, তোমার দেয়ার মত ক্ষমতা নেই আর তুমি কখনো দিবেও না। এখন যেহেতু দিয়ে দিয়েছ তাই এখন যাও। অতঃপর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসলেন, শুনে তিনি অনেক হাসলেন এবং বললেন, ঠিক হয়েছে, এমনই হওয়া উচিত ছিল।" *(জুমুআর খুতবা ২৪ জুলাই ১৯২৫; খুতবাতে মাহমূদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৭)*

মোহরানার গুরুত্ব সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন,

"অতএব 'মোহরানা নির্ধারণ' গ্রহণ করার জন্যই হয়ে থাকে মাফ করে দেয়ার জন্য নয়, এটি গ্রহণ করাটাই নারীর অধিকার। যারা মাফ করতেই চান তারা প্রথমে বলুন যে, মোহরানার টাকা আমাদের হাতে দাও আর এরপর যদি মন এত বড় হয়, এতই যদি উদার হয়ে থাকেন, তাহলে ফেরত দিয়ে দিন।

যাহোক, মোহরানার পরিমাণ যদি বেশি ধার্য করা হয় আর এরপর যখন 'খুলা' বা তালাকের সিদ্ধান্ত হয় তখন কাজা বা বিচার বিভাগের মোহরানা পুনঃনির্ধারণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ যদি কারো সামর্থ্য না থাকে আর অন্যায়ভাবে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে; আর এমন ঘটনা ঘটে থাকে। অনেকে এমনও আছে যারা আদালতের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধী করে নেয় আর ছেলে-মেয়ে উভয়ই এতে জড়িত আর পরবর্তীতে তারা বলে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই অধিকার ছিল; এরপর তারা আবার জামা'তেরও শরণাপন্ন হন। যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকার থেকে থাকে তাহলে আইনী অধিকার নেয়ার পরিবর্তে শরীয়তসম্মত অধিকার নাও। কখনো কখনো প্রাপ্য অধিকার দেশীয় আইনে শরীয়তসম্পন্ন অধিকারের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তাই অধিকার যেকোন এক দিক থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অন্যায় করা উচিত নয়। কোন এক পক্ষের ওপর অবিচার করা উচিত নয়। ছেলের ওপরও নয় আর মেয়ের ওপরও নয়। পরিতাপ! এজন্য মিথ্যারও আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো এমন অপছন্দনীয় কাজ যা দেখে একজন ভদ্র ও সভ্য মানুষ এটিকে ঘৃণা না করে পারে না।" *(জলসা সালানা*

জার্মানী, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

তালাকের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদের পরিস্থিতিতে মোহরানা পরিশোধ করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন,

"কোন কোন দাম্পত্য কলহ এমনও সামনে আসে, যেক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, আমি তোমাকে ছাড়বোও না, তালাকও দিবো না আর তোমার সাথে সংসারও করবো না। কাযা বা বিচারিক আদালতে যদি এমন মোকদ্দমা থাকে তাহলে অযথাই মোকদ্দমাকে প্রলম্বিত করা হয়। এমনসব অজুহাত ও বাহানা খোঁজা হয় যার ফলে মামলা দিনের পর দিন ঝুলে থাকে। আমি এর আগেও অনেকবার একথা বলেছি, অনেককে এ কারণে তালাক দেয়া হয় না, যাতে স্ত্রী নিজ থেকেই 'খোলা' নিয়ে নেয় আর যাতে মোহরানা আদায় করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ মোহরানা আদায় করতে না হয়। সুতরাং এসব এমনই বিষয়, যা মানুষকে তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিজেদের সংশোধন কর, তোমরা যদি নিজেদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও ক্ষমার আকাঙ্খী হয়ে থাক তাহলে নিজেরাও করুণা প্রদর্শন কর এবং স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে ঘরেই সুখ শান্তি তো রাখ। আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপক করুণা থেকে যদি অংশ লাভ করতে চাও তাহলে নিজের দয়ামায়াকেও বিস্তৃত কর।"

তিনি আরো বলেন,

"আমি এখনই তালাকের কথা বলছিলাম যে, অনেক পুরুষ তালাকের মামলাকে ঝুলিয়ে রাখে এবং দীর্ঘসূত্রিতার মাঝে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম কথা হলো, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে, আর কখনো কখনো সন্তানাদিও হয়ে যায় এরপর তালাকের পালা এসে যায়। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী তা স্পষ্ট আর তা প্রদান করা পুরুষের আবশ্যিক কর্তব্য। এছাড়া সন্তানদের খরচাদি এবং মোহরানা ইত্যাদিও রয়েছে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয় যে মেয়ে স্বামীর বাড়ী যায় নি বা মোহরানাও নির্ধারিত হয় নি; সেক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নারীর অধিকার আদায় কর। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَّاجُنَاحَعَلَيْكُمْإِنطَلَّقْتُمُالنِّسَاءَمَالَمْتَمَسُّوهُنَّأَوْتَفْرِضُو
الَهُنَّفَرِيضَةًوَمَتِّعُوهُنَّعَلَىالْمُوسِعِقَدَرُهُوَعَلَىالْمُقْتِرِقَدَرُ
هُمَتَاعًابِالْمَعْرُو فِحَقًّاعَلَىالْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথবা এমন অবস্থায় যখন তাদের জন্য দেনমোহর ধার্য কর নি। আর তোমরা তাদের কিছুটা উপকার সাধন কর, বিত্তবানের ওপরও তার সামর্থ অনুযায়ী আবশ্যক এবং বিত্তহীনের ওপর তার সাধ্যানুযায়ী অর্থাৎ ন্যায়সংগতভাবে তাদের উপকার সাধন করা আবশ্যিক। সৎকর্মশীলদের জন্য এটি অবশ্য কর্তব্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্বামীর পক্ষ থেকে যদি সম্বন্ধ না রাখার প্রশ্ন উঠে, এর কারণ যা-ই হোক না কেন, পুরুষের কর্তব্য, এই বিবাহ বন্ধনের ইতি টানার সময় স্ত্রীর প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা'লা যদি স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন তাহলে পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, সেই ঐশ্বর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। যদি ঐশ্যর্যের বহিঃপ্রকাশ না কর তাহলে যে আল্লাহ্ তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তিনি তা প্রত্যাহার করারও ক্ষমতা রাখেন। তিনি স্বচ্ছলতা দান করেছেন, যদি প্রাপ্য অধিকার আদায় না কর, সুন্দর ব্যবহার না কর তাহলে তিনি স্বচ্ছলতাকে অস্বচ্ছলতায় পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন যদি হতে চাও তাহলে স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে নিজের স্বচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ কর। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে বোঝা অর্পন করেন না তাই তিনি বলেছেন, দরিদ্র যদি বেশি দেয়ার সামর্থ্য না রাখে তাহলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু প্রাপ্য প্রদান করতে পারে– করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ন ও তাকওয়াশীল হয়ে থাক তাহলে এই অনুগ্রহ করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মহানবী (সা.) এ বিষয়ে কতটা কড়াকড়ি আরোপ করেছেন তা স্পষ্ট হয় একটি হাদীস হতে। একবার এক আনসারী বিয়ে করেন এবং এরপর সেই নারীকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেন এবং তার দেন-মোহরও ধার্য করা হয় নি। এই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উত্থাপিত হলে তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে অনুগ্রহ করে কিছু দিয়েছ? উত্তরে সেই সাহাবী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে তো তাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। তখন তিনি (সা.) বললেন, তোমার কাছে যদি দেয়ার মত কিছুই না থাকে তাহলে তোমার মাথায় পরিহিত টুপিটিই তাকে দিয়ে দাও। (রূহুল মাআনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮৫-৭৮৬, তফসীরে সূরা বাকারা, আয়াত নম্বর ২৩৭ দ্রষ্টব্য)

এ থেকে স্পষ্ট হয়, মহানবী (সা.) নারীর অধিকারের বিষয়ে কত জোর দিয়েছেন আর কতবেশী যত্নবান ছিলেন! এ ঘটনায় (তিনি বলেন) দেন-মোহর ধার্য না হলেও কিছু না কিছু অবশ্যই দাও। কিন্তু যদি দেন-মোহর পূর্বেই ধার্য করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অর্থাৎ যখন দেন-মোহর ধার্য করা হয়ে গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এর অর্ধেকাংশ পরিশোধ কর।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ জুন ২০০৯)

সম্পর্ক বন্ধনে তিক্ততা সৃষ্টির কতিপয় কারণ: অপছন্দের বা অসম্মতির বিয়ে

বাধ্য হয়ে যেসব বিয়ে করা হয়, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এর কোন কোনটির ক্ষেত্রে

তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন,

"অনেক মেয়ে পিতামাতার কথায় বিয়ে করে ফেলে। প্রথমে সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলার সাহস পায় না। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এমন কিছু আচরণ সামনে আসে যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আস্থা কমে যায় আর ঝগড়াবিবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কখনো কখনো বিয়ে করে পাকিস্তান থেকে চলে আসে, জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে খোঁজখবর নেয়া হয় না বা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় না; পরে আবার বলা হয় যে, জামা'ত আমাদের সাথে কোন সহযোগিতা করে নি। এখানে বসবাসকারী কিছু ছেলে বিয়ে করে মেয়েদেরকে আনিয়ে নেয় এবং তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন করে আর এরপর সম্পর্ক বিচ্ছেদ বা তালাকে গড়ায়। সুতরাং উভয় পক্ষ থেকেই এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে যা সম্পর্কে জামা'তের চিন্তা করা উচিত।

মেয়েরা অনেক সময় বিয়ের পর বলে বসে, আমার এই সম্বন্ধ পছন্দ নয়। পিতামাতা বলেছিলেন তাই বাধ্য হয়েছিলাম। কোন কোন ছেলেও বিয়ের পর এমন কথা বলে। ছেলেদের মধ্যেও এতটুকু সৎসাহস নেই। অনেক সময় পরে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে অন্য কারো সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল বা অন্য কোন সম্বন্ধ পছন্দ করে। প্রথমেই যদি এরা নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়ে দেয় তাহলে এভাবে দুটি পরিবারের শান্তি বিপন্ন হতো না। অধিকন্তু এমন ঘটনাও রয়েছে যেখানে পিতামাতা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি অবগত থাকেন, কিন্তু তবুও বিয়ে করিয়ে দেন এ ধারণায় যে বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যাবে– অথচ এমনটি হয় না। ছেলে হোক বা মেয়ে, তারা শুধরায় না, কিন্তু দু'জনের মাঝে একজনের জীবন তো অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়।" *(জলসা সালানা জার্মানী, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)*

এই একই প্রসঙ্গে অপর এক উপলক্ষে হুযূর (আই.) বলেন,

"উপরন্তু কিছু মেয়ে এমন জায়গায় বিয়ে করতে চায় যেখানে পিতামাতার মত থাকে না; যেমন, ছেলে আহমদী নয় বা ধর্মের সাথে ছেলের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মেয়ে গোঁ ধরে বসে যে, আমি সেখানেই বিয়ে করবো। অপরদিকে ছেলেদের বেলায়, কোন কোন ছেলে এমন কিছু আচরণে বা কর্মে লিপ্ত হয়ে যায় যা গোটা পরিবারকে দুর্নামের কারণ হয়। অতএব, এজন্যই এই দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ্ আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কোন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করো না বরং তাদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও। আর এই দোয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই এমনকি সন্তান গর্ভে আসার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই করা উচিত।" *(জুমুআর খুতবা, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, লন্ডন; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪)*

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর এক ভাষণে আহমদী নারীদের মর্মস্পর্শী নসীহত করে বলেছেন, "ধর্ম সম্পর্কে সর্বদা একজন আহমদী মেয়ের এই চেতনাবোধ থাকা উচিত যে, আমি আহমদী এবং আমি যদি জামা'তের বাইরে কোথাও বিয়ে করি তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে পারে এবং আমার বিশ্বাসেও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে কেননা অন্য ঘরে গিয়ে, ভিনধর্মীর ঘরে গিয়ে, তাদের প্রভাবে আমিও প্রভাবিত হতে পারি।" *(জলসা সালানা যুক্তরাজ্য, মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ২৮ জুলাই ২০০৭; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ নভেম্বর ২০১৫)*

অপর এক উপলক্ষে হুযূর (আই.) বলেন, "এরপর এমন মামলাও এখন সামনে আসছে যাতে দেখা যায়, বিয়ে হতে না হতেই ঘৃণা-বিদ্বেষও দেখা দেয় এমনকি বিয়ের সময়ই ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে যায়। বিয়ে তাহলে করলে কেন? দুর্ভাগ্যবশত এখানে অর্থাৎ এসব দেশে এমন ঘটনার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। হয়তোবা আহমদীরাও অন্যদের রঙ ধারণ করছে। অথচ আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজ ধর্মের রঙে রঙিন করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। অতএব, যদি পছন্দসই বিয়ে নাও হয়ে থাকে তবুও উচিত ছিল একসাথে বসবাস করা, একে অপরকে বুঝা এবং সেই উপদেশে অভিনিবেশ করা যার ভিত্তিতে তোমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ অর্থাৎ তাকওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। সব কিছু করার পরও যদি তোমাদের মধ্যকার ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ কর আর এর জন্যও প্রথমে নির্দেশ হলো, দু'জন মীমাংসাকারী নির্ধারণ কর, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বস, চিন্তা কর এবং গভীরভাবে ভেবে দেখ; উভয় পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। পরিতাপের বিষয় হলো, বিরল ঘটনা হলেও কোন কোন মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম দিনই এই দাবি উত্থাপিত হয় যে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এর সাথে থাকবো না। খতিয়ে দেখলে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে পিতামাতার চাপের মুখে বিয়ে করে নিয়েছিল কিন্তু আসলে তাদের অন্য কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং পিতামাতারও ভাবা উচিত এবং দু'টি জীবনকে এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।" *(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, লন্ডন; আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৬)*

মূল: 'আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল' হতে সংগৃহীত

-অনুবাদ মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, বাংলাডেস্ক ঢাকা

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ১ম আঞ্চলিক দাঈ ইলাল্লাহ প্রশিক্ষণ ক্লাস

গত ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১১টায় কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ১ম আঞ্চলিক দাঈ ইলাল্লাহ প্রশিক্ষণ ক্লাস কটিয়াদী 'বায়তুল আহাদ' মসজিদে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে তবলীগ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় মেহমান। ১২:৩০ মিনিটে জুমুআর নামাযের জন্য বিরতি দেয়া হয়। নামাযের পর খাবার পরিবেশন করা হয়, খাবারের পর পুনরায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেন্দ্রীয় মেহমান বিকাল ৫টা পর্যন্ত তবলীগে প্রয়োজনীয় কুরআন ও হাদিসের অংশ মুখস্থ করানোর পাশাপাশি এর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। দাঈ ইলাল্লাহগণ তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে বীরপাইকশা, চরসিন্দুর জামাতের মোয়াল্লেম, কটিয়াদী, তেরগাতী জামাতের মুরব্বীসহ মোট ৩১ জন দাঈ ইলাল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। আমরা যেন আমাদের এই পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে বেশি বেশি তবলীগ করতে পারি তার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

সুলতান আহমদ লিটন
জেনারেল সেক্রেটারী

বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ওয়াকফে নও সম্মেলন গত ১২ জুলাই ২০১৯ তারিখ আহমদীয়া মুসলিমজামা'ত, সৈয়দপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাভিদুর রহমান, দোয়া পরিচালনা করেন সম্মেলনের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব বশীর আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আলহাজ্জ ডা. তাহের আহমদ বাচ্চু, বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর। আরো উপস্থিত ছিলেন, বিভাগী ওয়াকফে নও সেক্রেটারী সাহেবের সফরসঙ্গী, জনাব মোতালেব হোসেন খান সাহেব, ডা. রেজাউল করীম সাহেব অতঃপর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহেবের

বক্তৃতার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বক্তৃতাপর্বে বক্তৃতা প্রদান করেন, জনাব ডা. রেজাউল করীম সাহেব, এরপর ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ডা. তাহের আহমদ বাচ্চু বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর রিজিওন। অতঃপর ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন ইলমি ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতা হয়।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নজিবর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন সভাপতি মোহাম্মদ নজিবর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আমুজা সৈয়দপুর। বক্তৃতা প্রদান করেন শরীফ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্, বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল। অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ডা. তাহের আহমদ বাচ্চু বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর রিজিওন। উক্ত সম্মেলনে প্রায় সব জামা'ত থেকে ওয়াকফে নও ও তাদের পিতা-মাতা উপস্থিত ছিল। এরপর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় এবং সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ওয়াকফে নও সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের দাঈ-ইলাল্লাহ্ ক্লাস-২০১৯

গত ২৩ আগষ্ট বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের দাঈ-ইলাল্লাহ্ ক্লাস-২০১৯ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সৈয়দপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

কটিয়াদী জামাতে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ও ৩১ আগষ্ট কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে বেতাল হালকা ও আচমিতা হালকা পকেটে তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বেতাল সেমিনারের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ সাহেবসহ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, স্থানীয় মুরব্বী তেরগাতী জামাতের মুরব্বী ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৩৩ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান বাদ মাগরিব থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে। ৩১ আগষ্ট আচমিতা হালকা পকেটে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বাদ আছর থেকে তবলীগি সভা শুরু হয়। প্রথমেই আমাদের পরিচিতি লিফলেট পাঠ করে শোনানো হয়, পরে মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, তিনজন মুরব্বী সিলসিলাহ। সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান দেখে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। মেহমানদের আপ্যায়নের মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়। মেহমান ছিলেন মোট ১১ জন। ৩০ আগষ্ট বৈরাগীরচর হালকাতে মোট ৪ জন সদস্যা বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। কটিয়াদি জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্য সবার নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরুব্বী সিলসিলাহ্
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৮/২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলার উদ্যোগে এক লাজনা বোনের বাসায় সীরাতুন নবী (সা.) দিবস উদযাপন করা হয়। বিকাল ৩.৩০ হতে ৬.৩০ পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলে। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস পাঠ ও নযম এর পর নবীজি (সা.)-এর বাল্যজীবন ও নুওয়ত লাভ, ঈমান আনার পর মুসলমানদের অত্যাচারিত হওয়া, মদীনায় ইসলাম প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে পারভীন বেগম, আমাতুল মজিদ, ফারহানা কবির সাহেবা। শেষে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাহেবা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল লাজনা ৯ জন, নাসেরাত ৩ জন ও শিশু ৩ জনসহ মোট ১৫ জন।

আমাতুল মজিদ
সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলা স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২১ আগষ্ট হতে ২৩ আগষ্ট ৩ দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলার উদ্যোগে ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। গত ২১ তারিখ বিকাল ৪টা হতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এতে ১১ জন এবং ২ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। ২২ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট হতে লাজনা ও নাসেরাতের মৌখিক পরীক্ষা কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে যোহর ও আসরের নামায এবং খাওয়া দাওয়ার পর নাসেরাতের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা হয়। ২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দু'জন ফাতেমা নুসরাত ও মোবারেকা জাহান সাহেবা পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এরপর লাজনা ও নাসেরাতের কুইজ ও বালিশ খেলা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ। এসময়ে তাঁরা কিছু তরবিয়তী আলোচনাও করেন, এরপর জুমুআর নামায ও দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ৩টা হতে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নযম পাঠের পর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ স্থানীয় লাজনা সদস্যদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার শুকরিয়া জ্ঞাপন প্রতিযোগিদের মাঝে বিজয়ী পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে আবারো দোয়া করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়। ইজতেমার ২২ তারিখ এর উপস্থিতি ছিল লাজনা ১১ জন, নাসেরাত ৩ জন এবং ২৩ তারিখ এর উপস্থিতি ছিল লাজনা ১৭ জন, নাসেরাত ৪ জন, শিশু ৫ জন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২০/০৭/২০১৯ তারিখ হতে ২৪/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলার উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে মসজিদে বিকাল ৪টা হতে ৬.৩০ পর্যন্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে কেন্দ্রীয় সিলেবাসের আলোকে ইজতেমার জন্য কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করা, নযম ও লিখিত পরীক্ষার বিষয়াবলী নিয়ে ক্লাস করা হয়। ক্লাস নেন আমাতুল মজিদ সাহেবা। উক্ত ক্লাসের উপস্থিতি ছিল গড়ে লাজনা ৬ জন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীখোলার উদ্যোগে পিঠা উৎসব আয়োজন

গত ০৬/০৯/২০১৯ তারিখ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ধানীলোখার উদ্যোগে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই দিবসের মোট উপস্থিতি ছিল লাজনা ১২ জন, নাসেরাত ৩ জন, শিশু ৩ জন। উপস্থিত লাজনাদের মধ্যে ৭ জন এবং ১ জন নাসেরাতসহ মোট ৮ জন বিভিন্ন ধরণের নাস্তা ও পিঠা-পুলি বানিয়ে নিয়ে আসেন। সদস্যরা মাংস পুলি, নারকেল পিঠা, মশলার নকশা পিঠা, পোয়া পিঠা, তিলিলে পিঠা, পেঁপের পাকোড়া, ডিম পিঠা, ঝিলমিল ও পাতার পিঠা, ডালের হালুয়া, হাত সেমাই, নারকেল পুলি ইত্যাদি মজাদার মিষ্টি ঝাল স্বাদের নাস্তা তৈরি করে আনেন। এই পিঠা জুমুআর নামায শেষে পুরুষদের অংশেও পরিবেশন করা হয়। পুরুষ ও লাজনাগণ অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসের সাথে পিঠা খায় ও স্বাদ অনুভব করে। পিঠা তৈরীর কৌশল ও বাহারী স্বাদের গল্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অত্যন্ত আনন্দের মাধ্যমে আমাদের সেদিনটি কাটে। পিঠা পরিবেশনকারী সকল লাজনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমাতুল মজিদ
সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত

সৈয়দপুর জামাতে আল ওসিয়্যত পুস্তরেক উপর পাঠচক্র

১৬ আগষ্ট, ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর জামাতের মসজিদে আল ওসিয়্যত পুস্তকের উপর পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন এবং পুস্তক পাঠে অংশগ্রহণ করেন ২৩ জন।

মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 5th & 6th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th September, 2019 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

MTA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)